তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫৮

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬০

তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

স্বনামধন্য

প্র. না. বি.

ও

কবি-ঔপন্যাসিক

প্রমথনাথ বিশী

প্রীতিভাজনেষু

টালা, কলিকাতা
১০, ১, ৫২

কান্না

বিকেলবেলার এসপ্লানেড—বিচিত্র জায়গা। যেন জনসমুদ্রের তটভূমি, বিকেলবেলা সে. সমুদ্রে জোয়ার আসে। জনসমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে সবুজ মাঠ ঢেকে যায়। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকল্লোলের মতই কলবর ওঠে। বর্ষায় ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা, শীল্ড প্রতিযোগিতা, শীতে ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট, টেনিস, মনুমেন্টের পাদদেশে মীটিং তো বারো মাস লেগেই আছে।

মেট্রোর সামনে সারি সারি মোটর, ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে ট্যাক্সি, ট্রাম-স্টেশনে সারি সারি ট্রাম; ক্রমাগত আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে লোক আনছে আবার নিয়েও যাচ্ছে। বেলা চারটে থেকে জোয়ার আসতে শুরু হয়, ছটা নাগাদ একেবারে যাকে বলে—ষাঁড়াষাঁড়ির বান, তাই ডেকে যায়; তারপর থেকেই জোয়ার নামতে শুরু করে, সাড়ে নটা দশটায় বান নেমে যায়, এগারটায় এসপ্লানেড খাঁ-খাঁ করে। ময়দানের রাস্তার ধারে শুধু গ্যাসের নীলাভ স্থির নিষ্কম্প আলোগুলো জলতে থাকে। দূর থেকে চৌরঙ্গীর পশ্চিম দিকের গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলোগুলিকে দেখে মনে হয়—অতীতকালে, সেই যখন জবচার্নক নবাবদের আক্রমণের ভয়ে দুর্গম আশ্রয়স্থল খুঁজতে বেরিয়ে এই সুতোনুটি গোবিন্দপুর কলকাতা প্রভৃতি জনপরিত্যক্ত জলো মৌজা-গুলি ইজারা নিয়েছিল—যখন এখানে বাঘ ঘুরে বেড়াত, ডাকাতেরা বাস করত, সেই তখনকার দিনের অপঘাতে মরা মানুষেরা গভীর

রাত্রে মাটি ঠেলে উঠে বিস্ময়বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে—কি জায়গা কি হয়েছে! নীলাভ আলোগুলি যেন তাদেরই প্রেতদৃষ্টি।

এরই মধ্যে এক-একদিন একটি বিচিত্র সঙ্গীতের সুর বেজে ওঠে গভীর রাত্রে। যন্ত্র-সঙ্গীত। উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত চৌরঙ্গীর পূর্ব দিকে যে পরিচ্ছন্ন ফুটপাথটি, বড় বড় বাড়ির কোল ঘেঁষে চলে গেছে সেখানে নয়। রাস্তার ওপারে বড় বড় গাছের সারির অন্ধকার তলদেশ দিয়ে যে পথ চলে গেছে, সেই পথে। কোন কোন দিন পার্ক স্ট্রীটের মোড় থেকে কোণাকুণি ময়দানের মধ্য দিয়ে যে পথটি চলে গেছে লাট সাহেবের বাড়ির দিকে, সেই রাস্তার পাশে পাশে। কোনদিন বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের ময়দানের চারি-পাশের রাস্তায়। অদ্ভুত মনে হয়। জনবিরল ময়দান তখন খাঁ-খাঁ করে। তার মধ্যে এই বাজনা বেজে বেড়ায়। যেন ওই ময়দানের অন্ধকারে যে সব অশরীরী আত্মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেড়ায়, ওই মরা চাঁদের দীপ্তির মত যারা চোখ চেয়ে বসে থাকে—তাদেরকেই কেউ গান শুনিয়ে বেড়ায়। সেও বোধ হয় ওই প্রেতদেরই একজন। জীবিত ছিল যখন, তখন সে পূর্ব দিকের ওই আলোকিত ফুটপাথে কি কোন হোটেলের দোরে দাঁড়িয়ে যন্ত্র বাজিয়ে ভিক্ষা করত। জীবিত মানুষ যদি হয়, তবে ওই প্রেতলোকের সঙ্গে সে নিশ্চয় গভীর মায়ার বন্ধনে বাঁধা।

সন্ধ্যেবেলা সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে যদি চাঙোয়া রেস্তোরাঁর সামনে দিয়ে হাঁট, তবে দেখতে পাবে একজন অন্ধ তারের যন্ত্র বাজিয়ে মোটা ভরাট গলায় গান গাইছে। অন্ধ। হোটেলে যারা ঢুকছে বেরুচ্ছে, তারা দিয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু। ওই সময়েই যদি চৌরঙ্গীর পুব দিকের ফুটপাথ ধরে হাঁট, তবে প্রচুর লোকের মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় কানে আসবে তোমার যন্ত্র-সঙ্গীতের

একটি ঝঙ্কার। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে—কালো লম্বা একটি মানুষ, পরনে সাহেবী পোষাক, গলিত দুটি চোখে অপলক ভঙ্গীতে সামনের দিকে তাকিয়ে বগলে-ধরা তারের যন্ত্রটি বাজিয়ে চলেছে ফুটপাথ ধরে। বিদেশী সঙ্গীতের সুর; প্রথমেই একটু অপরিচিত হয়তো মনে হয়। কিন্তু একটু মন দিয়ে শুনলেই মনে হবে---উঁহু, অপরিচিত তো নয়! রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি নয়?—"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।" আসলে, হৃদয়-বেদনার সঙ্গে প্রার্থনার সুর মেশানো সকল ভাষার সকল দেশের গানের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে, সঙ্গতি আছে। পৃথিবীতে আনন্দ বা উল্লাস প্রকাশের ভঙ্গী বহু বিচিত্র; কিন্তু হৃদয়-বেদনা প্রকাশের সুর একটিই, কান্নার সুর। প্রার্থনার সুরের মধ্যেও এমনই একটি সকল দেশের হৃদয়স্পর্শী সুর আছে।

যাক সে কথা।

লোকটিকে লক্ষ্য করলে দেখবে, লোকটির চোখ নেই বটে কিন্তু পা দুটির আশ্চর্য একটি শক্তি আছে। চৌরঙ্গী থেকে পুবমুখে রাস্তা তো একটি দুটি নয়—অনেক। এবং সন্ধ্যের পর থেকে যত মানুষ তত গাড়ি চলে এই সব পথে। অন্ধ মানুষটি একেবারে বাড়িগুলির গা ঘেঁষে ফুটপাথ ধরে যন্ত্র বাজিয়ে পথ চলে, কোন একটা রাস্তার মোড়ের ঠিক কয়েক পা থাকতে আশ্চর্যভাবে সতর্ক হয়। মন্থর পদক্ষেপ আরও মন্থর করে, একেবারে রাস্তার কিনারায় ফুটপাথের উপরে এসেই ঠিক থমকে দাঁড়ায়; বাজনা-বাজানো বন্ধ করে হাতখানি বাড়িয়ে বলে, 'অন্ধ মানুষকে একটু সাহায্য কর। এই পথটুকু পার করে দাও হাত ধরে।' গলিত চোখ দুটির জলসিক্ত অপলক চাউনি একটু উপরের দিকেই নিবদ্ধ থাকে, ঠোঁটের রেখার ভঙ্গীতে আর হাতখানিতে

সাহায্য প্রার্থনার ইঙ্গিত ফুটে ওঠে ;—সাহায্য চেয়ে হাতখানি সাহায্যকারীকে খোঁজে। এইভাবেই দক্ষিণ থেকে সে উত্তরমুখে বরাবর চলে আসে ; এসে, মেট্রো সিনেমা পার হয়ে একটা বন্দুকের দোকানের পাশে পুবমুখো গলির ভিতর ছোট একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বসে । এইখানেই ও তার রাত্রের খাওয়া খেয়ে নেয়। ওখানকার বয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ । ম্যানেজারের সঙ্গেও পরিচয় আছে।

দোকানে ঢুকেই বলে, গুড ইভনিং !

ম্যানেজার বলে, গুড ইভনিং ! এস জনি সাহেব, এস। মিঃ জনি ওয়াকার !

সঙ্গে সঙ্গেই একজন বয় এসে ওর হাত ধরে যে টেবিলটা খালি এবং এক পাশে, সেইটেতে বসিয়ে দেয়। হাত ধরবামাত্র জনি বা জন বুঝতে পারে কে তার হাত ধরেছে ; সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে প্রশ্নের সুরেই তাকে সম্ভাষণ জানায়, করিম চাচা ? সালাম আলায়কুম !

বুড়ো করিম চাচা বলে, আলায়কুম সালাম, বাবাজান জনি।

অথবা বলে, রহিম ভাই ? সালাম !

রহিম বলে, সালাম ভাইসাব !

বড় ভাই কেমন আছ ?

আচ্ছা ! আচ্ছা হ্যায়।

চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তারা চলে যায়। এবার জন সাহেব পকেট থেকে তার ভিক্ষেয়-পাওয়া মুদ্রাগুলি বের করে হাত বুলিয়ে সিকি দু-আনি আনিগুলি গুনে হিসেব করে দেখে,কত ভিক্ষে সে পেয়েছে। হঠাৎ কোন বড় মুদ্রা—আধুলি কি টাকা হাতে ঠেকলে চমকে ওঠে। টাকা কদাচিৎ হাতে ঠেকে, তবে মাসে একটা দুটো আধুলি হাতে ঠেকে। ঠেকলে সে প্রথমেই মুদ্রাটিতে হাত বুলিয়ে দেখে, নাকের

কাছে ধরে শুঁকে দেখে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। করিম অথবা রহিম কি সোলেমানের পায়ের শব্দ উঠলেই ডাকে, করিম চাচা! কি—রহিম ভাই! কি—এ ভাই সোলেমান!

তারা কাছে এলে সেটি তাদের হাতে দিয়ে বলে, দেখ তো, ঠিক, না, মেকী! কেমন যেন ঠেকছে আমার!

যেটার গন্ধে এবং স্পর্শে ওর সন্দেহ হয়, সেটা নিঃসন্দেহে মেকীই প্রমাণিত হয়। রহিম বা করিম সেটা দেখবার আগেই বলে, তোমার যখন সন্দেহ হয়েছে তখন দেখতে হবে না। ও মেকী। এবং আলোর কাছে ধরতেই সীসের চেহারাটা ধরা পড়ে যায় ওদের চক্ষুষ্মান দৃষ্টিতে।

সেদিন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল জনি সাহেব। ওর অন্ধ চোখ দুটি একেবারে গলিত চোখ; জলসিক্ত লালচে দুটি কোমল মাংসখণ্ড দুটি অক্ষিকোটরে বসে রয়েছে; এই কারণেই বোধ হয় ওর মনের ভাব ঠিক মুখে অভিব্যক্ত হয় না। অমাবস্যার রাত্রে বিদ্যুৎহীন মেঘলা আকাশের মত ওর মুখ ভাবপ্রকাশপঙ্গু।

করিম অপেক্ষা করে রয়েছে, জনি সাহেবের খাবারের বরাত শোনবার জন্য। আজ করিমই তার হাত ধরে এনে তাকে টেবিলে বসিয়েছে। ভিক্ষের সিকি দু-আনি আনি গুনে দেখা শেষ হয়েছে, এইবার তার অর্ডার দেবার কথা। ডেকে বলার কথা—রুটি আর আধ প্লেট মাংস। বেশি কিছু পেয়ে থাকলে এর উপর কাবাব বা একটা চপ। যাবার সময় একটা আনি সে দিয়ে যাবে। তারপর বলবে, গুড নাইট! কিন্তু আজ জন সাহেবের হল কি? চুপ করে বসে রয়েছে! মেকী কিছু পেলে সেদিন এক-আধ মিনিট এমনই চুপ

করে থাকে জন ; কিন্তু সেও তো তাকে দিয়ে মুদ্রাটা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার পর। কাল একটা টাকা পেয়েছিল জন। আসল টাকা। টাকা বলেই নিজে নিঃসন্দেহ হয়েও করিমকে দেখিয়ে নিয়েছিল। সংসারে মেকী টাকা চালাতে না পেরে অনেকে সেটা দান করে পুণ্য অর্জন করে নেয়। মেকী মুদ্রা অন্ধকে দেওয়াই প্রশস্ত। কালকের টাকাটা আসল টাকাই ছিল।

করিম জানে না, আজও জনি একটা টাকা অনুভব করেছে। এবং আসল টাকা। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, উপরি উপরি দুদিন টাকা পেলে সে। বিস্ময়ের কথা নয়? এবং স্পষ্ট তার মনে পড়ছে—গ্র্যাণ্ড হোটেল পার হয়ে পুরনো এম্পায়ার থিয়েটার ছিল যে রাস্তাটার উপর, সেই রাস্তাটার মোড়ে একজন লোক তার হাত ধরে পার করে দিয়ে তার পকেটে কিছু ফেলে দিয়েছে। স্পষ্ট মনে রয়েছে। বাকি যা পেয়েছে তা সবই তার হাতে পড়েছে। এবং—এবং—। চঞ্চল হয়ে উঠল জন। মনে হল, দুদিনই যেন একই লোক তার হাত ধরেছিল। এতটা খেয়াল সে করে নি এতক্ষণ। কিন্তু ঠিক একই স্থানের পট-ভূমিতে দানের পরিমাণ এবং দেওয়ার ভঙ্গীর সাদৃশ্য এতক্ষণে মুহূর্তে তাকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তুললে। লোকটি নিঃশব্দে রাস্তা পার করে দিয়ে দুদিনই একটি একটি টাকা তার পকেটে ফেলে দিয়েছে।

—কে? কেন? কেন সে এমন ভাবে দুদিন দুটো টাকা তাকে দিলে? ধনী লোক? না। অন্ধজন আপন খেয়ালেই ঘাড় নাড়লে। ধনীর গায়ে একটা গন্ধ আছে। পোশাকের একটা শব্দ আছে। স্পর্শের একটা চেহারা আছে। খুব দয়ালু সরল সহজ ধনীরও আছে। এ লোক তো তা নয়! আবার সে ঘাড় নাড়লে।

—কি হল জন সাহেব? ঘাড় নাড়ছ কেন?—করিম জিজ্ঞাসা করলে এবার, বল, কি আনব?

—চাচা করিম!

—হ্যাঁ, বাবাজান।

—দেখ তো চাচা করিম, বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে কেউ লক্ষ্য করছে কি না?

—না তো।

—দেখ, তুমি ভাল করে দেখ।

—খদ্দের রয়েছে বাবাজান, তুমি কি খাবে আগে বল।

তার অন্তরের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য করিমের বোঝবার কথা তো নয়। করিম আবার তাকে বললে, জলদি কর বাবাজান!

—যা দাও, তাই। দুখানা রুটি আর মাংস। আর—

—আর? চপ?

—না। থাক।

কালকের টাকাটা তার খরচ হয়ে গিয়েছে; এ টাকাটা থাক। একজন অজ্ঞাত সহৃদয় সুহৃদের দেওয়া টাকাটা সে ভাঙাবে না। স্মৃতিচিহ্নের মত রেখে দেবে। কেউ দাঁড়িয়ে নেই দরজার সামনে?

দুই

কলকাতার এলিয়ট রোড সাপের মত আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাস্তা। ওয়েলেস্‌লির ট্রাম-লাইন চলে গিয়েছে এই রাস্তার উপর দিয়ে। সারকুলার রোডে যেখানে ট্রামওয়ের পাওয়ার-হাউস সেখান থেকেই রাস্তাটির শুরু। দুই পাশে ক্রীশ্চানপল্লী। সামনের বাড়িগুলো

পুরনো হলেও সম্ভ্রান্ত। কিন্তু গলির ভিতরে সে এক দারিদ্র্যজীর্ণ শ্বাসরোধী বস্তি। আঁকাবাঁকা অলিগলি নোংরা রাস্তা। ওরই ভিতর থেকে ঠিক সন্ধ্যার মুখে জন বেরিয়ে আসে তার যন্ত্রটি হাতে নিয়ে। ওখান থেকে পার্ক স্ট্রীট ঘুরে চৌরঙ্গীতে এসে উত্তরমুখে হাঁটতে শুরু করে। মিউজিয়ম পার হয়ে, ওয়াই. এম. সি. এ, ফির্পো, গ্র্যাণ্ড হোটেল অতিক্রম করে চলে আসে। এইসব জায়গায় গতি একটু মন্থর করে। এখানেই ভাল ভিক্ষে মেলে। অন্তত আগে মিলত। তখন ছিল ইংরেজের আমল। চৌরঙ্গী গিসগিস করত—ইংরেজ নরনারীতে। কত বিদেশী আসত! তাদের পোশাকের খসখস শব্দ, তাদের গায়ের গন্ধ, পোশাকের সেণ্টের গন্ধ চৌরঙ্গীর বাতাস ভারী করে রাখত। মধ্যে মধ্যে এই সঙ্গে নাকে ঢুকত, কড়া অথচ অতি চমৎকার চুরুটের গন্ধ। কানে আসত ভারী গলার একটু অনুনাসিক স্বর, ইংরেজ পুরুষের গলা; সঙ্গে তেমনই মিহি মেয়েলী কণ্ঠস্বর। রাত্রি বেশি হলে শুনতে পেত খিলখিল হাসি, উচ্চ কণ্ঠস্বর। এখন সে গন্ধ, সে শব্দ পাওয়া যায় কদাচিৎ। ইংরেজরা চলে গেছে এ দেশ থেকে। দুঃখ খানিকটা হয় জনের। সে কালো মানুষ, এই দেশেরই মানুষ; কিন্তু তাদের সমধর্মাবলম্বী বলে একটা মমতা আছে। আবার চলে গিয়েছে এটাও ভাল লাগে। চৌরঙ্গীর ফুটপাথে উলঙ্গপ্রায় যে সব এ দেশের ভিখিরী আজও বিদেশীর পিছনে লালায়িত হয়ে ধাওয়া করে, তাদের কি কুৎসিত গালিগালাজই না তারা দিত! তাকে? তাকেও কতদিন দিয়েছে গালাগাল—নিগার ব্লাডি!

ওই সন্ধ্যার পরের দিনের সন্ধ্যা। আজ কিন্তু জনের মনে এ সব চিন্তা উঠছিল না। সে আজ যথাসাধ্য দ্রুতপদেই চলেছে। আজ

ছাব্বিশ বৎসর অন্ধজীবনে নিত্যনিয়মিত এই পথে হেঁটে পথের প্রতিটি পদক্ষেপের স্থান তার জানা। চোখ নেই, কিন্তু তার মন এবং তার পা—এই দুটিই তার দুটি চোখের মত সজাগ। দ্রুতপদেই চলেছে সে। তার ধারণা, তার সেই অজ্ঞাত সহৃদয় দাতা আজও তার জন্য ঠিক জায়গাটিতে অপেক্ষা করে আছে। নিশ্চয় আছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। আজ কি সে নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটা আগে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, আগেই যাচ্ছে। পার্ক স্ট্রীটের কোণে যেখানে ঘড়ি আছে সেখানে সে নিত্যই কাউকে-না-কাউকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যালো মিস্টার, কটা বেজেছে ঘড়িতে বল তো? আজ তা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। মনের ব্যগ্রতায় ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আজ যে সে আগে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। টাইগার সিনেমার ওখানে সে সেটা টের পেলে। ওখানে আজ ভিড় রয়েছে। শো আরম্ভ হয় নি—লোকজন সিনেমায় সবে ঢুকছে। রাস্তায় মোটর এসে থামছে। দর্শক নামছে। সে সাতটার কিছু আগে যখন ওখানটা পার হয় তখন ওখানে লোকের ভিড় থাকে না। নতুন করে মোটর এসে থামে না। তাহলে অন্তত আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে এসেছে সে। একবার সে দাঁড়াল। এখনই কি সে এসেছে সেখানে?

আবার চলল সে। ওই রাস্তার মোড়ে সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। তার যন্ত্রটি বাজিয়ে চলবে।

তাই এসে সে দাঁড়াল।

কিন্তু বাজনা বাজানো হল না। এসপ্লানেডের আকাশ-বাতাস চঞ্চল করে, লাউড স্পীকারে উচ্চ চীৎকার তার তারের যন্ত্র-সঙ্গীতকে শাসন করে যেন বলছে—থাম তুমি। ও-বাজনা থামাও। স্লোগান দিচ্ছে একজন আর হাজার কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি উঠছে।

—ইয়ে আজাদী—

—ঝুটা হ্যায়।

—ইনকিলাব—

—জিন্দাবাদ।

নিরুৎসুক চিত্তে সে দাঁড়িয়ে রইল। সে বুঝতে পারছে শোভাযাত্রীরা চলেছে। মনুমেণ্টের তলা থেকে ধর্মতলায় মোড় ফিরে পথে পথে ধ্বনি তুলে মানুষকে দলে টানবার জন্য চলছে ওরা কালের যাত্রায়। তার মন ও-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয় না। ও ভাবছে, ধর্মতলায় এখন ট্রাফিক বন্ধ হয়েছে, চৌরঙ্গী এবং কর্পোরেশন স্ট্রীটের মোড়ও অবরুদ্ধ। অপরিচিত সেই লোকটি বোধ হয় এই কারণেই আসতে পারছে না।

* * *

রাত্রি তখন পৌনে এগারটা। ময়দান জনবিরল হয়ে এসেছে।

অন্ধকার ময়দানে বিমল দক্ষিণ থেকে চলে আসছে উত্তরে। বিচিত্র ময়দান তার চেয়েও বিচিত্র মানুষ। এই ময়দানে গাছতলায় মানুষ শুয়ে আছে। রীতিমত ঘরসংসার পেতে তারা বাস করছে। দিনে গোরু চরে, খেলা হয়, প্যারেড হয়। রাত্রে শুধু মানুষ ঘোরে। আশ্চর্যভাবে মানুষের চেহারা পালটায় রাত্রে। গাছে ঢাকা পথ। পথের পর পথ, মধ্যে মধ্যে রাস্তার চৌমাথায় সাদা-রঙ-করা আধখানা কাটা তেলের পিপে গোল করে সাজিয়ে তার উপর লাল আলো জেলে দিয়েছে। পথের পাশে স্থির হয়ে জলছে ইলেক্‌ট্রিক আলো, গ্যাসের আলোগুলো জলছে নীলচে প্রেতচক্ষুর মত। ময়দানের তাঁবু-গুলো বন্ধ। মধ্যে মধ্যে রাস্তার কালভার্টের মাথায় দুজন-তিনজন লোক বসে রয়েছে। বিচিত্র সন্দিগ্ধ রাত্রিচর।

ময়দান দেখে বেড়ায় বিমল। ওটা যেন তার নেশা—নিশির ডাক। কিছুদিন থেকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে ওই ময়দানের গভীর রাত্রের যন্ত্র-সঙ্গীত! প্রথম দিন এই সঙ্গীত সে শুনেছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের উত্তর-পশ্চিম পাশে কোথাও। সেদিন ভয় হয়েছিল।

খানিকটা অগ্রসর হয়েই থমকে গিয়েছিল। মনে পড়েছিল কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের কর্তার সতর্কবাণী—'রাত্রির ময়দান শয়তানী মায়ায় আচ্ছন্ন; মনোরমের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায় ভয়ঙ্কর; সকরুণ মোহিনী মায়ার আকর্ষণে মানুষকে টেনে এনে অকস্মাৎ অন্ধকারের মধ্যে ছদ্মবেশ উন্মোচন করে নিঃশব্দ নিষ্ঠুর হাসি হেসে প্রেত তোমার মুখোমুখী দাঁড়াবে।' এই তো কিছুদিন আগে ময়দানে পড়ে ছিল একটি ছেলের মৃতদেহ। সমস্ত মনে করে বিমল সেদিন পিছিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু অদ্ভুত সে যন্ত্র-সঙ্গীত। মনে হয়, পৃথিবী কাঁদছে, মাটি কাঁদছে, বাতাস কাঁদছে, ময়দানের বড় বড় গাছগুলির নিবিড় পত্র-পল্লব থেকে কান্না ঝরে ঝরে পড়ছে। মৃতের দৃষ্টির মত নীলচে গ্যাসের আলোগুলি ম্যাণ্টেলের বুনুনির ফাঁকে ফাঁকে কাঁপছে ওই সুর শুনে। ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যেই মিলিয়ে যায় সে যন্ত্র-সঙ্গীত।

আবার দিন পাঁচিশেক পর সেই গান তার কানে এসেছিল। রাত্রি তখন বারোটা। ঠিক মাঝময়দানে কোথাও এ সঙ্গীত উঠছিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনেছিল, কিন্তু তবু সে ঠাওর করতে পারে নি। মনে হয়েছিল, চারদিকেই গান উঠছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজতে চেষ্টা করেছিল সে—কোথায় উঠছে এ সঙ্গীত? কে

বাজাচ্ছে? চারিদিক চাইতে চাইতে সে পথ চলছিল। হঠাৎ কে একজন খপ্ করে তার হাত চেপে ধরেছিল।

একই সঙ্গে, যে তার হাত চেপে ধরেছিল সে এবং নিজে সে দুজনেই প্রশ্ন করে উঠেছিল. কোন্ হ্যায়?

—কে?

যে ধরেছিল, সে একজন কন্স্টেব্ল। সে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে বলেছিল, কে তুমি? এখানে কেন এমনভাবে ঘুরছ?

বিমল একবিন্দু ভয় পায় নি। মনের মধ্যে তার তখন গভীর উত্তেজনা, উত্তেজিতভাবেই সে প্রশ্ন করেছিল, ওই বাজনা! কোথায় বাজছে? কে বাজাচ্ছে?

কন্স্টেব্লটা তার গায়ের গন্ধ শুঁকে তাকে বলেছিল, না, তুমি তো মাতাল নও। কিন্তু তুমি কি পাগল? ওই বাজনা খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কোথায় বাজছে জান? ওই বাজনা?

—চল, যেখানে বাজছে, তোমাকে নিয়ে যাই। থানায় চল।

—থানায়? কেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। থানায়। থানামে যানে হোগা।

সেদিন কয়েকটা টাকা দিয়ে খালাস পেয়েছিল বিমল। টাকা পেয়ে কন্স্টেবলটি তার সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করেছিল। বলেছিল, বাবুজী, তুমি মনে হচ্ছে ভাল লোক। এভাবে এত রাত্রে ময়দানে ঘুরো না। আর ওই গান? ও-গান কখনও কখনও শোনা যায় কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে। ও হচ্ছে ভুতপ্রেত কি জিন বা পরীদের গান।

সেইখানে দাঁড়িয়েই সে তাকে ময়দানের অনেক ভৌতিক লীলার কাহিনী শুনিয়েছিল। সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে, গভীর রাত্রে বড় বড় গাছের ডাল থেকে হঠাৎ দড়ি গলায় দিয়ে প্রেতেরা ঝুলে পড়ে। দোল খায়। সে নাকি দেখেছে, গাছতলার অন্ধকার থেকে ছুটে প্রেত বেরিয়ে আসে, বুকে তার বসানো মস্ত বড় একটা ছোরা; রক্তাক্ত দেহে ছুটে এসেই পড়ে যায় রাস্তার উপর, রক্তে ভেসে যায় রাস্তার পিচ। কিন্তু চোখ পালটাতে না পালটাতে, বাস, আর কিছু নেই। সে এসব নিজের চোখে দেখেছে। ওই যে ময়দানের মধ্যে নালা, ওই নালার মধ্য থেকে শুনেছে কান্নার শব্দ। আরও বললে—এবার যা বলছি তা আমি নিজে দেখি নি, আমি আমার ভাই বেরা-দারের কাছে শুনেছি;—ওই যে কেল্লার এলাকা, ওই এলাকায় নাকি এক-একদিন ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়সওয়ার ভূত ছুটে বেড়ায়; ছুটে আসে তুফানের মত—পথে হঠাৎ ঘোড়ার পায়ে কিছুতে হুচোট লাগে, সঙ্গে সঙ্গে সওয়ার আর ঘোড়া পড়ে যায় মাটির বুকে মাথা গুঁজে। চারখানা পা তুলে ঘোড়াটা ছটফট করে, সওয়ারটার দেহখানা নড়েই না। ঘাড় ভেঙে পড়ে সওয়ার আর ঘোড়া দু-ই খতম হয়ে যায়। কিন্তু সেও ওই চকিতের মত। চোখ মোছ, আর কিছু নেই। এ ময়দান—অনেক খেল-খেলা হয়েছে এ ময়দানে বাবুজী। এখানে রাত্রিবেলা কিছু খুঁজতে এসো না। বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে—এগারটার পর। আর পূর্ণিমাতেও এসো না। সে সময় লাগে হুরীদের খেলা।

সেদিন ওদিকে গঙ্গার বুকে কোন জাহাজ ভোঁ দিয়ে উঠেছিল। রাত্রি বারোটা। বেজে চলল মহানগরীর টাওয়ার ক্লকে ক্লকে বারোটা শব্দ—এদিকে ওদিকে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে; পশ্চিমে গঙ্গা। এক

মিনিট আধ মিনিটের তফাত দিয়ে বেজে চলেছিল—ঢং—ঢং,—ঢং—ঢং,—ঢং—ঢং,—ঢং—ঢং,—ঢং—ঢং,—ঢং—ঢং।

*   *   *   *   *

তারপর আর বিমল শোনেনি ওই বাজনা। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ফুটপাথে জনের বাজনা শুনে তার মনে হল, এর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে সে বাজনার। এই ধারণায় জনের পিছনে সে পর পর দুদিন হেঁটেছে। দুদিনই তাকে দুটো টাকা দিয়েছে মনের আবেগে। পিছনে পিছনে মেট্রোর পর ওই গলির মধ্যে জনকে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখে, সেও রেস্তোরাঁয় ঢুকে কাছের টেবিলেই বসেছিল। করিমের সঙ্গে কথাবার্তা শুনেছিল। জন বেরিয়েছে, দক্ষিণমুখে হাঁটতে শুরু করেছে; সেও হেঁটেছে। পার্ক স্ট্রীট হয়ে ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীট ধরে বরাবর এলিয়ট রোডের গলি পর্যন্ত অনুসরণ করেছে। পার্ক স্ট্রীটের পর তার বাজনা থামে। যন্ত্রটি বগলে নিয়ে গ্যাসের এবং ইলেক্‌ট্রিকের আলোর স্বপ্নালু স্বল্প দীপ্তির মধ্য দিয়ে সাদা-পোশাক-পরা কালো লম্বা লোকটি সতর্ক পদক্ষেপে একটি বিষণ্ণ রহস্যের মত চলেই—চলেই—অবশেষে এলিয়ট রোডে একটা গলির মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বিমল তখন শঙ্কা অনুভব করেছিল। রাত্রির মহা-নগরী—মধ্যরাত্রির পর থেকে প্রেতপুরীর মত রহস্যময়—বড় বড় বাড়িগুলির উপরতলায় আলো নিবে যায়, রাস্তার আলো উপরের দিকে—খানিকটা পর্যন্ত আবছা আলো ফেলে তার উপরে অন্ধকার, তাতে মনে হয় বাড়িগুলো যেন হেঁট হয়ে নেমে আসতে চাইছে। কেমন সব যেন ছমছম করে। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে মানুষ দেখা যায়, —তাদের চোখের দৃষ্টি ক্রূর তীক্ষ্ণ অসুস্থ। প্রতি গলির অন্ধকার মোড়টিতে যেন শঙ্কাজনক কিছু ওত পেতে আছে বলে মনে হয়।

তিন

বিমল সেদিন সত্যই আটকেছিল—ওই রাজনৈতিক মিছিলের জন্য। পথে নয়, সে সেদিন ওই সভার মধ্যেই ছিল একজন শ্রোতা। বিশ্ব-রাজনৈতিক 'পরিস্থিতি'তে দুই শিবিরে বিভক্ত পৃথিবীর মানুষ আজ আপন আপন আদর্শ, আপন আপন দাবি নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। অন্নহীন বস্ত্রহীন মানুষের শ্রমশক্তি, তার উপার্জন, তার জীবন-মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, ধর্মের নামে ঈশ্বরের বিধানের নির্দেশ ঘোষণা করে পৃথিবীকে দুঃখজর্জর করে তুলেছে। তারই প্রতিকার করবে বিপ্লব। তাই বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। মানুষ জেগেছে। শক্ত মুঠোয় তারা তুলে ধরেছে সেই ইনকিলাবের ঝাণ্ডা। বিপ্লবের জয়ধ্বজা। এই ছিল সে দিনের মীটিংয়ের বক্তব্য। কিন্তু ওই নেতাদের হাতে তুলে দাও তোমাদের ভাগ্য!

শুনতে শুনতে তার সমস্ত দেহে মনে ক্ষুব্ধ উত্তেজনার উত্তাপ সঞ্চারিত হল। নিজের মর্মলোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বাসনা সব ঢেকে যেন একটা বন্যা এল। দেহকোষ-নিঃসৃত যে কামনা-বাসনার ধারা, তার জীবন-নদীর বুক বেয়ে গ্রীষ্মের নদীর মত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ ধারায় মৃদু-সঙ্গীত তুলে বয়ে চলেছিল, তার উপর নেমে এল যেন দুর্জয় উত্তেজনার আকস্মিক এক আকাশ-ভাঙা বর্ষণ। দুকূল ছাপিয়ে বইতে লাগল। মনে হল, জীবন-প্রবাহের তটভূমিও বুঝি ভেঙে পড়বে। বিমল হাসলে, পড়ে পড়বে, ক্ষতি কি! বদলে যাবে জীবন-নদীর আকার! তা যাক। সফল হোক বিপ্লব।

সভা ভেঙে গেল, মিছিলের সঙ্গেই সে কিছুদূর গেল। তারপর

সেখান থেকে ফিরে এসে বসল কার্জন পার্কে স্থরেন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তির নীচে। ভাবতে লাগল ওই কথাগুলিই। ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

কতক্ষণ বসে ছিল হিসেব করে নি। হঠাৎ খেয়াল হল, সামনে রাস্তার ওপারে বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসের কণ্ডাক্টার হাঁকছে—লাস্ট বাস। বরানগর—দক্ষিণেশ্বর—শ্যামবাজার। নয়া রাস্তা। লাস্ট বাস। চকিত হয়ে উঠল সে। এবার বাড়ি যাওয়া উচিত। হোয়াইটওয়েের বাড়িটার গম্বুজের টাওয়ার-ক্লকটার দিকে তাকালে, ঘড়িটার ভিতরের আলো নিবিয়ে দিয়েছে। তা হলে দশটা বেজে গিয়েছে। সে উঠে দ্রুতপদে চলল—ট্রাম-স্টেশনের দিকে। ট্রাম-স্টেশন ছাড়িয়ে এসে দাঁড়াল এসপ্লানেডের উত্তর-পূর্ব কোণে। ট্রাম হোক, বাস হোক, একটা পাওয়া যাবেই।

জনবিরল হয়ে আসছে মহানগরী। এসপ্লানেডের ট্রাম-এলাকার মধ্যেও লোকজন কম। ট্রাম-বাসও চলছে দেরিতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, মহানগরীতে নিশির মায়া নামবে। ওই ময়দানের গাছের মাথায় মাথায়; ওই বড় বড় বাড়িগুলির ছাদের মাথা ঘেঁষে আকাশ পরিব্যাপ্ত করে সে মায়া প্রতীক্ষা করে রয়েছে। এইবার সে নেমে আসবে প্রকাণ্ড এক বিশালপক্ষ পাখির মত; শহরজোড়া বিপুলবিস্তার পক্ষ দুটিকে ছড়িয়ে মহানগরীর জীবনকে ঢেকে বসবে। তার পাখার পালকে পালকে কত স্বপ্ন, কোনটা কালো কঠিন ক্রুর দুঃস্বপ্ন, কোনটা নীলাভ মসৃণ কোমল সুস্বপ্ন। তার পাখার পালকের ফাঁকে ফাঁকে সচেতন সক্রিয় হয়ে উঠবে অসংখ্য কীট; পাখির পাখার উকুন। মহানগরীর কলরব, যন্ত্রঘর্ঘর যখনই স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই শুনতে পাবে—ঝিঁঝিঁর ডাক, রাত্রিচর পাখির ডাক, সতর্ক কান পাতলে শুনেতে পাবে—সরীসৃপ-

সঞ্চরণের শব্দ। এইবার তারা বের হবে। গাছের তলা থেকে ছায়ামূর্তিরা বের হবে। ঘুরে বেড়াবে। শিস শুনতে পাবে। শিস দিয়ে কথা বলবে—সাংকেতিক ভাষায়। সেই বিখ্যাত পরিত্যক্ত বাড়িটার দরজা-জানলা খুলতে আরম্ভ হবে; চৌঘুড়ী এসে ঢুকবে; বাইরে থেকে শুনতে পাবে পোশাকের খসখস শব্দ, পদধ্বনি বাজতে থাকবে। ময়দানে ঘোড়সওয়ার ছুটবে। সেই বাজনা বাজবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী কি চতুর্দশী। বোধ হয় বাজবে সেই বাজনা। কাঁদবে। আকাশ থেকে কান্না ঝরবে, গাছের পল্লব থেকে কান্না ঝরবে—গাঢ় অন্ধকার বেয়ে বেয়ে ঝরবে মানুষের মর্মান্তিক বেদনার কান্না। এই সময় হঠাৎ যেন সব সুর কেটে গেল।

চমকে উঠল বিমল।

কেউ একজন মদ্যপান করে প্রমত্ত উল্লাসে চীৎকার করে গান গাইতে গাইতে চলেছে—কাছেরই কোন রাস্তা ধরে। তার সঙ্গে প্রাণপণ জোরে বাজিয়ে চলেছে একটা যন্ত্র। গানের মধ্যে হয়তো কোন ত্রুটি নেই, কিন্তু সুর আসুরিক চীৎকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে বিকট হয়ে উঠেছে। মুহূর্তে বিমলের চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠল। ফিরে তাকাল সে। কে? কে? আশ্চর্য হয়ে গেল। একখানা রিক্শা চেপে চলেছে সেই অন্ধ খ্রীষ্টান ভিক্ষুক জন সাহেব; যে ফুটপাথে ওই যন্ত্রটায় প্রার্থনার সুর বাজিয়ে ভিক্ষে করে ফেরে, যাকে সে পর পর দু দিন হাতে ধরে রাস্তা পার করে দিয়ে এক টাকা করে দু টাকা দু দিনে ভিক্ষে দিয়েছে, যাকে সে মনে করেছিল—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে ময়দানে বাদ্যযন্ত্রে যে কান্নার গান বাজে সেই যন্ত্র-সঙ্গীতের শিল্পী। হায়! হায়! হায়! হায় রে, পৃথিবীতে বিস্ময়ের আর শেষ নেই! অথবা পৃথিবীতে কিছুই বিস্ময়কর নয়। পৃথিবীর মানদণ্ডে

ভাল আর মন্দ—দুটি পাল্লায় সমান ভারী। আলো আর অন্ধকারের মত। সেই লোক মদ খেয়ে এমন আসুরিক চীৎকারে গান গাইতে পারে—এ কি কেউ কল্পনা করতে পারে?

হঠাৎ বিমলের যেন কি হল। সেও মদ্যপায়ীর মতই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দ্রুতপদে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একখানা রিক্শায় চেপে বসে বললে, চলো, ওই—ওই—রিক্শার পিছনে। ওই যে রিক্শায় গান গাইতে গাইতে ওই কালা সাহেবটা যাচ্ছে, ওরই পিছনে চলো। বহুৎ হুঁসিয়ারিসে। কিছুটা এসেই জন স্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ রিক্শাওয়ালাটা রিক্শা নামিয়ে ঢাকাটা তুলে দিলে। এ আবার কি হল? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সে দেখবে।

শেষ পর্যন্ত বিমল কিন্তু আপসোস করলে। কেন যে সে উত্তেজনা বশে এই মদ্যপ ভিক্ষুকটির অনুসরণ করেছিল, তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ সে নিজেই দেখতে পেলে না। অন্ধ খ্রীষ্টান ভিক্ষুকটা রিক্শাওয়ালাকে সিকি বা আধুলি কি দিয়ে বাড়ি ঢুকে গেল টলতে টলতে। বিমলও রিক্শা ছেড়ে দিয়েছিল। বাড়ির মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর, তার অনুশোচনা হল। এই আসাটাই অপব্যয় বলে মনে হল। এর পর কি আর পয়সা খরচ করে রিক্শা চড়ে ফেরা চলে? কিন্তু এই অঞ্চলটাও ভাল নয়। এখান থেকে হয় ধর্মতলা-ওয়েলিংটনের মোড় অথবা সারকুলার রোড। ওয়েলেস্লির ট্রাম-বাস হয়তো বন্ধই হয়ে গেছে। ট্রাম ফিরবে—আর যাবে না। সারকুলার রোড যাওয়া যাবে, কিন্তু উত্তরে যাওয়ার ট্রাম পাওয়া যাবে না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শ্যামবাজার-ফিরতি বাস-ট্রাম মিলতেও পারে, কিন্তু এখান থেকে ওয়েলিংটন স্কোয়ার যাওয়ার বাস-ট্রাম যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রিকশাটা ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি।

চুপ করেই সে দাঁড়িয়ে রইল, কোন রিক্শা বা কোন যানের অপেক্ষায়—ফিটন কি ট্যাক্সি।

হঠাৎ একটা শব্দে সে চমকে উঠল। খুব কাছেই কোথাও ভারী কিছু যেন পড়ে গেল। কোথায়? কে? চারিদিকে চেয়ে দেখতে গিয়ে নজরে পড়ল—সামনের ওই গলিটার ভিতরেই কেউ যেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। পড়ে গিয়েছিল। শাদা একটা মূর্তি। বিস্মিত হল বিমল। এ যে সেই অন্ধ ভিক্ষুক জন সাহেব। আবার বেরিয়ে এসেছে, মদ্যপানের ফলে পায়ের ঠিক নেই, পড়ে গিয়েছিল, উঠে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে এসে সে ফুটপাথের উপর দাঁড়াল। লোকটার যেন বিচিত্র পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে অন্ধ চোখ দুটি মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, যেন কোন অদৃশ্য লোককে সন্ধান করছে, খুঁজছে। হঠাৎ সে হাত বাড়ালে—যেন কারুর দিকে বাড়িয়ে দিল। তারপর সে চলল। টলতে টলতে—মধ্যে মধ্যে থেমে—দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে এগুতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়াল মিউজিয়মের সামনে। দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নামল পথের উপর। বিমল বুঝতে পারলে, মোটরের শব্দ শুনে যে মুহূর্তে বুঝলে—দুপাশেই শব্দ দূরে চলে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তটি বেছে নিয়ে পথে নেমে এপারের ময়দানে এসে উঠল।

* *

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি! ময়দানের গাছের তলায় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে প্রতীক্ষমাণ হয়ে রয়েছে। পথে সারি দিয়ে অনির্বাণ জ্বলছে পথের আলোগুলি। এগুলি যদি নিবে যায়, তবে মুহূর্তে নিঃশব্দে ওই অন্ধকার গ্রাস করবে সমস্ত পৃথিবীকে। জন চলেছে যেন ওই ওরই সন্ধানে।

অন্ধ অন্ধকারের পর অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ায়,আবার চলে। দাঁড়ায়, সেই ভঙ্গিতে উপরের দিকে চেয়ে—কিছু যেন অনুভব করে, তারপর আবার চলে। আশ্চর্য,অন্ধকারকে সে যেন স্পর্শ করে বুঝতে পারছে।

এখন সেই বিরাট নিশীথিনী পাখিটা নিঃসন্দেহে মহানগরীর বুকে নেমে এসেছে পাখা বিস্তার করে। চৌরঙ্গীর পুব ফুটপাথে বিজ্ঞাপনের রঙিন আলোর সমারোহ নিবে গিয়েছে। ময়দানে জেগে উঠেছে ঝিঁঝিঁর ডাক। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের মাথার গম্বুজ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। গ্যাসের আলো কতকগুলো নিবে গিয়েছে, কয়েকটা ভাঙা ম্যাণ্টেলের মধ্যে আলো রোগগ্রস্তের রাঙা চোখের মত বিকৃত হয়ে উঠেছে। কদাচিৎ পিচের রাস্তায় দ্রুতসঞ্চারী শব্দের রেশ টেনে প্রচণ্ডবেগে একখানা দুখানা মোটর চলে যাচ্ছে। হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে বেজে উঠছে ইলেক্ট্রিক হর্ন। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ। হোটেলের বাজনা নেই—স্তব্ধ, মানুষের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ, ট্রাম-বাসের ঘর্ঘর স্তব্ধ। চারিদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতা। তারই মধ্যে অন্ধকার ময়দানের ঘাসের উপর জনের পদধ্বনি উঠছে মস-মস মস-মস। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আকাশে বাদুড়ের পাখার শব্দ উঠছে, মধ্যে মধ্যে প্যাঁচা ডেকে উঠছে শ্যাঁস—শ্যাঁ—স—শ্যাঁস—স।

নিশির মায়ায় অভিভূতের মত বিমলও তার অনুসরণ করে চলল।

ময়দানের বুক চিরে মধ্যে মধ্যে রাস্তা। রাস্তার পর রাস্তা অতিক্রম করে চলেছে জন, কখনও খানিকটা পশ্চিমমুখে—কখনও খানিকটা দক্ষিণমুখে, কখনও এক-একবার দাঁড়াচ্ছে। যেন ঠিক করে নিচ্ছে, কোন পথে হাঁটবে। বার কয়েক গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেলে বার কয়েক পড়লও। কিন্তু আবার উঠল, আবার চলল। লোকটাও চলেছে নিশির ডাকে অভিভূতের মত।

হঠাৎ! হঠাৎ বিমলের মনে হল, জন নেই! যেন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল বিমল। কোথায় গেল? কি হল? ঘন বৃক্ষসমাবেশের অন্ধকারের মধ্যে মানুষটা মিলিয়ে গেল? মায়াবী? না, জাদুকর? না, প্রেত? এ কি জন নয়? যে ওই গলি থেকে বেরিয়ে এল, যার পিছনে পিছনে অতদূর এসেছে বিমল, সে কি জন নয়? তারই রূপ ধরে তাকে ছলনায় ভুলিয়ে এখানে এনেছে—নিশীথ নগরীর মায়া, তার নিজের মনের গভীরের কল্পনার ছবি? একটা কম্পন অনুভব করলে সে। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন উঠল যন্ত্র-সঙ্গীতের সুর। বাজতে লাগল সেই বাজনা। কান্না, অতি করুণ কান্না। আকাশে ছড়াল, গাছের পত্রপল্লবে সঞ্চারিত হল, বাতাস শীতল হয়ে এল, ঝিঁঝিঁর ডাকে সে সুরের প্রতিধ্বনি উঠল। বাজতে লাগল। বেজে চলল।

অভিভূতের মত, না—প্রায় সংজ্ঞাহীনতার সীমারেখায় পা দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে বিমলও সেই গাছতলার অন্ধকারে বসে পড়ল। চারিদিকে ঘন গাছপালা; থমথম করছে অন্ধকার; কোথাও কেউ নেই।

চার

বাজনা যখন থামল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কৃষ্ণা দ্বাদশী কি ত্রয়োদশীর চাঁদ পূর্বদিকে চৌরঙ্গীর বাড়িগুলোর মাথা পার হয়ে ময়দানের পূর্বপ্রান্তে দেখা দিয়েছে। তির্যক ধারায় তিনকলা চাঁদের পীতপাণ্ডুর জ্যোৎস্না মাঠখানাকে খানিকটা স্পষ্ট করে

তুলেছে। সে আলোয় গাছে গাছে কাকেরা একবার ডেকে উঠল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের মাথায় পড়েছে চাঁদের আলো।

বিমলের সর্বাঙ্গ ভারী হয়ে উঠেছে। তবু সে এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরে পেলে। নড়ে-চড়ে বসবার সামর্থ্য এল তার দেহে। এতক্ষণে তার চোখে পড়ল, সামনেই একটা গভীর নালা।

গাছের সারির তলা দিয়ে নালাটা চলে গিয়েছে। এক হাঁটু গভীর নালা, তারই মধ্যে অন্ধ ভিক্ষুকটা তার বাদ্যযন্ত্রটা বুকে ধরে পড়ে রয়েছে। ওই নালাটার মধ্যে লোকটা ঢুকেছিল বা পড়ে গিয়েছিল বলেই মনে হয়েছিল—লোকটা অন্ধকারের মধ্যে বুঝিবা মিলিয়ে গেল।

বিমল একবার এগিয়ে গেল। তাকে ডাকলে, হ্যালো, জন!

চমকে উঠল লোকটা। তারপর একটা চীৎকার করে উঠল ও-হ্! ফাদার!

দুই হাত বাড়িয়ে দিল সে। বিমল পিছিয়ে এল। সে আবার চীৎকার করলে, ফাদার! ও-হ্ ফাদার!

(ক)

অনেকক্ষণ পর।

উপরের দিকে মুখ তুলে জন বললে, চাঁদের আলো কি পরিপূর্ণ ভাবে মাঠের উপর পড়েছে? গাছের ফাঁক দিয়ে কি খানিকটাও আমার মুখে পড়ছে না?

—যাবে? পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় গিয়ে বসবে?

—চল।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বসে আকাশের দিকে মুখ তুলে সে বললে, তুমি ভগবান মান? শয়তান মান? দেবদূত মান?

বিমল একটু হাসলে। কিন্তু কোনও কথা বললে না।

সে বললে, মান না, না?

বিমল বললে, সে কথা থাক্। কিন্তু তুমি এইভাবে বাজনা বাজাও কেন? আজ তো তোমাকে আমি অনুসরণ করেছি সেই মদ খেয়ে রিক্শা চড়ে যখন গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফের তখন থেকে। আমি ফুটপাথে তোমার বাজনা শুনেই অনুমান করেছিলাম—এ গান তুমি বাজাও।

—হ্যাঁ। আমি, আমি বাজাই। এই ময়দানে এমনি ক্ষণ ছাড়া ও-গান আমি কিছুতেই বাজাতে পারি না। আসে না। আমার বাবা—। সে চুপ করে গেল, শুধু অস্ফুট মৃদুস্বরে ডাকলে, ফাদার!

চোখ দিয়ে তার জল গড়াতে লাগল।

•

আমার নিজের বাবা নয়। আমার বাবাকে আমি দেখি নি। মাকেও খুব মনে নেই। খুব অল্প মনে পড়ে। এত অল্প যে তার কিছুই তোমাকে বলতে পারব না। শুধু একটি মেয়েছেলেকে মনে পড়ে। তবে নানী বলত—হিন্দুর ছোট জাতের ছেলে, সে আর কত ভাল হবে? নানী আমাকে মানুষ করেছিল। নানী ছিল লম্বা এক-জন মেয়েছেলে—চুলগুলো তখন আধপাকা-আধকাঁচা, নাকে বেসর ছিল, কানে মাকড়ি পরত। হাতে ছিল একহাত করে কাচের চুড়ি, দাঁতে মিশি নিত। একটা মাটির ফুরসিতে তামাক খেত আর চীৎকার করত। আমাকে গাল দিত। ঝুড়িতে চুড়ি সাজাত

আর গাল দিত—মরে যা, মরে যা, হারামজাদ, ছোট জাতের বাচ্চা, শয়তানের বেটা শয়তান!

নানী চুড়ি বেচত। সে ছিল চুড়িওয়ালী।

নানীর হাতে কেমন করে যে পড়েছিলাম, সে আমার মনে নেই। নানী বলত, নসিবে ঝাড়ু মারি, এক হারামজাদ বদমাসের পাল্লায় পড়ে আমার এই ফ্যাসাদ। আমার কন্ধার উপর বেফয়দা এই বোঝা চেপে গেল। বেচব বলে আনলাম, কেউ কিনলে না, হয়ে রইল আমার কন্ধার বোঝা।

নানীর এও একটা ব্যবসা ছিল। কে একজন নাকি নানীর কাছ থেকে লেড়কী লেড়কা কিনত। নানী আমাকে সেই ভরসায় আমার মায়ের মৃত্যুর পর আমার মায়ের মাসি সেজে আমাকে ঘরে নিয়ে এসেছিল। আমার মাকে নানী চিনত। আমি তখন অন্ধ ছিলাম না। সুন্দর পৃথিবীকে তখন দেখেছি। তখন তো জানতাম না—একদিন অন্ধ হয়ে যাব। তা হলে আরও ভাল করে দেখতাম। সবুজ ঘাস, রঙিন ফুল. নীল আকাশ, শাদা রোদ, সুন্দর মানুষ আমি দেখেছি, আমার মনে আছে। আঃ, নানী যদি সেদিন বেচে দিত আমাকে, তবে আমি অন্ধ হতাম না। নানীর ভালবাসাই আমার কাল হয়েছিল। অভিশপ্ত ভালবাসা!

নানী মুখে যা বলত বলত, ভাল কিন্তু বাসত। ভালবাসত বলেই আমাকে সে সেই মানুষ-কেনাবেচার ব্যবসাদারের হাতে বিক্রী করে নি। নইলে দশটা টাকা কি পনের টাকাও অন্তত পেতে পারত আমায় বেচে। কিন্তু সে আমায় বেচে নি। এমনই দাম বলত যে, লোকে পিছিয়ে যেত। নানী খরিদ্দারকে ভাগিয়ে দিয়ে বলত—নিকালো, ভাগো। যে পা পিছিয়েছ সে পা আর বাড়িয়ো না।

এই এমন একটা তাগদওয়ালা বাচ্চা, যা দেবে তাই খাবে—ঝুটা-মুঠা চোষা হাড়, বাসি আধপচা যা দেবে। আর খাটবে গিয়ে তাগদওয়ালা গাধার মত। দিনে আমার জন্যে কমসে কম দশ সের বয়লার-ঝাড়া কয়লা কুড়িয়ে আনে, ময়লার টিনা খুঁজে হরেক চিজ কুড়িয়ে আনে। আমার ঘরের বিলকুল পাটকাম করে, আর এই বেনিয়াপোখরের বস্তি থেকে আমার এই চুড়ির ঝুড়িটা মাথায় করে চলে শ্যামবাজার পর্যন্ত, আবার নিয়ে আসে বেনিয়াপোখর। গীত গাইতে পারে বুল-বুলের বাচ্ছার মত। যাও যাও, বেচব না আমি। যাও।

খরিদ্দারকে ভাগিয়ে দিয়ে আমাকে ডেকে শাসাত।

জন হেসে বললে, শাসন ঠিক নয়—সেটাই ছিল তার আদর। বলত—দেখলি? দেখলি রে হারামজাদ! অপয়া শুয়রের বাচ্চা! দেখলি? দুনিয়ার কেউ তোকে নেবে না। আমার যেমন মন্দ মতি, তোকে নিয়ে এলাম ঘরে। তোর ওই হাউজের মত পেটে এই এত—এত খাবার যোগাতে হবে। এখন যা, ওই বাজারটায় যা, এই ছটা পয়সা নিয়ে যা। ছ আনার মাল ঘরে আনবি, তবে খেতে দেব, ঘরে ঠাঁই দেব। নইলে পিঠে ভাঙব এই সটকার নল। নে এখন সেই গীতটা গা তো। আমি গান গাইতাম—তারপর বেরুতাম বাজারে।

এণ্টালিতে বিজলী রোড ধরে কি বেনিয়াপোখর লেন ধরে কখনও গিয়েছ ওই বস্তি এলাকায়? দেখেছ সে গিজগিজে বস্তি? মুসলমান আর ক্রীশ্চানদের পাড়া? তার একটু আগে মস্ত বড় গোরস্থান; তার ওপাশে মল্লিক বাজার। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আমার মত ভাগ্যের ছেলে;—শীতকালের নেড়ী কুত্তার বাচ্চার মত এক জায়গায় জোট পাকিয়ে বসে থাকে, কামড়াকামড়ি করে। রাস্তায় গুলি

খেলে, পয়সা খেলে, মারামারি করে। একটু সেয়ানা হলেই ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের তাঁবেদারি করে, কাটা ঘুড়ির পিছনে পিছনে ছোটে, মিথ্যে করে রাস্তায় পড়ে কাতরে কাতরে ভিক্ষে চায়, ভাল পোশাক-পরা লোক দেখলে বলে—সেলাম হুজুর। বলে আর সেলাম বাজিয়ে ভিক্ষের জন্যে পিছনে পিছনে চলে; ভিক্ষে না পেলে গালাগাল দেয়। তাদের দেখেছ? যারা বড় হয়ে গাঁট কাটে, ছুরি মারে, গুণ্ডাগিরি করে—তাদের বাল্যকালটা হল এই রকম। এদের দলের হালিম রহমন দবির টম হ্যারি শুকলাল কিষণ—এরা তখন আমার চেয়ে বড়। আমার বয়স তখন আট কি দশ, ওদের তেরো কি চোদ্দ। আমার দহরম-মহরম হালিম-দবিরের সঙ্গে। বাজারে সামনে বিড়ির দোকানে হালিমদের আড্ডা। বাজারের ভিতর কসাইয়ের দোকানেও বসে; হালিমের বাবার ছিল মাংসের দোকান। হালিমরা আমাকে ভালবাসত। এদের স্বভাব কাকের মত। লক্ষ্য করেছ কাকের স্বভাব? কাক ময়লা মাটি খায়, মাছ-মাংস মিষ্টির টুকরো চুরি করে কাড়াকাড়ি করে, কর্কশ আওয়াজ, কিন্তু স্বজাতির প্রীতিতে ওরা বোধ হয় দুনিয়ার মধ্যে সেরা। একটা কাক কি কাকের বাচ্চা ধরে দেখ তো? কি মেরে ফেলে দেখ তো? যেখানকার যত কাক এসে জুটবে, চীৎকার করবে, তোমাকে আক্রমণ করবে। বিপন্ন আহত কাকটাকে মুক্ত করবার, সাহায্য করবার চেষ্টা করবে। এরা ঠিক এই রকম। আমার নানীকে ওরা জানত। গালাগাল করত। আমাকে ভালবাসত। তারাই আমাকে সাহায্য করত;—ছ পয়সায় ছ আনার আনাজ মাংস সংগ্রহ করে দিত। আমাকে সংগ্রহ করা শেখাত। প্রথম প্রথম আমার ভয় করত। তারপর মনে হত, কঠিন কি? খুব সোজা কাজ। শুধু মাছ-মাংসের দোকানে একটু হুঁশিয়ারি

চাই। ওদের আছে বঁটি, চপার আর ছুরি। হঠাৎ ঝগড়াই যদি বাধে, তবে ওগুলোর আঘাত বড়ই সাংঘাতিক। মেছুয়া আর কসাই বড় ভয়ঙ্কর জাত। আমি চোখে দেখছি, বাজারে একজন মেছুয়া আমার চোখের সামনে বঁটির কোপ মেরেছিল খ্যাঁদা বসিরকে ; মুণ্ডুটা ছটকে গিয়ে পড়েছিল মার্বেলের গুলির মত ; কেউ যেন খুব মোটা বড় আঙুলে মুণ্ডুর গুল্লিটা ছুঁড়লে একটা গাব্বু লক্ষ্য করে, আর ধড়টা টলতে টলতে পড়ে গেল আছড়ে মাটির ওপর, ফিনকি দিয়ে ছুটল তাজা লাল টকটকে রক্ত।

একটু চুপ করে রইল জন। খানিকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আকাশে চাঁদ এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, না ? ভোরের আমেজ এখনও আকাশে লাগে নি, ভোর হতে দেরি আছে ?

একটু বিস্মিত হল বিমল। প্রশ্ন করলে, কি করে বুঝলে ? তোমার অন্ধত্ব তো ভান হতে পারে না !

—না।—জন হেসে বললে, গলেই গেছে চোখ ছুটো। ভান কি হয় !

—তবে ?

—কেন, কাক ডাকছে মধ্যে মধ্যে, শুনতে পাচ্ছ না ?

—হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে ছুটো একটা ভুল করে ডেকে উঠছে। এই জন্যেই তো এমন জ্যোৎস্নাকে কাক-জ্যোৎস্না বলে।

—ঠিক তাই। তোমরা ওটা শুনেও শোন না, চোখেই সব দেখছ। আমার চোখ নেই, আমি অন্য ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে ওর অভাবটা পূরণ করে নিই। যখন চাঁদ উঠল, তখন কাকগুলো ডেকে উঠল—সে ডেকে ওঠা স্বস্তির। আঃ, অন্ধকার কাটল, বাঁচলাম। তুমি চোখে চাঁদ ওঠা দেখলে, কাক ডাকা শুনেও গ্রাহ্য করলে না। আমি কিন্তু ওই ডাক শুনেই

তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, চাঁদের আলো কি আমার মুখে পড়েছে ? আমাদের বস্তিতে গাছে গাছে আছে কাকের বাসা। কত রাত্রিতে ঘুম হয় না. জেগে বসে থাকি। ওদের ডাক শুনি। শুনে শুনে ওদের ভাষা বুঝেছি। রাত্রি যে আমার কাছে ভয়ঙ্কর ! থাক্‌গে, শোন।

(খ)

আরও বছর দুইয়ের মধ্যে আমি পুরোদস্তুর উড়ন্ত কাক হয়ে উঠলাম। হালিম দবির রহমনের দলের তুখোড় ছোকরা হয়ে উঠলাম। একটা চাক্কু তখন কোমরে গুঁজে রাখি। বুলি শিখেছি—আবে শালা মারে চাক্কু ! আর গান শোনাই হালিমদের, আমার গলা বড় মিঠা ছিল।

দল বেঁধে বের হই। মল্লিক বাজারের,কসাইপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করি। গোবরার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করি। টম-হ্যারিদের সঙ্গে ঘুঁষোঘুষি করি। কালোয়ারদের ছেলেদের সঙ্গে লড়াই করি। সিনেমা-হলে গিয়ে হুল্লোড় করি। সিনেমা দেখে জিভের তলায় আঙুল রেখে সিটি মারি। বাড়িতে ফিরে এসে মারপিট করি নানীর সঙ্গে। নানী তখন দু বছরে বেশ খানিকটা মোটা হয়েছে ; আমিও বড় হয়েছি—সেয়ানা হয়েছি। নানী তার গতর নিয়ে নড়তে নড়তে আমি আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে সরে পড়ি। কিন্তু বুড়ী যেদিন ধরে,সেদিন সে মারে। মরিয়া হয়ে আমি শেষ মোক্ষম মার মারি, মারি মাথা দিয়ে তার থলথলে ভুঁড়িতে ঢুঁ। বুড়ী দু হাতে পেট ধরে বসে পড়ে। আমি সোজা ছুটে বেরিয়ে যাই। এক-একদিন সে লাঠি কি সটকার নল দিয়ে পিটত, সেদিন সে আমাকে ছেঁচত। সেদিন আমিও শেষ পর্যন্ত চাক্কু বের করতাম। তখন সে ভয়ে পিছিয়ে যেত। সেদিন পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকতাম বিজলী রোডের ধারে প্রকাণ্ড বড়

কবরখানাটায়। নানীর সঙ্গে যেদিন এমনি ঝগড়া হত সেদিন আমার মেজাজ কেন কে জানে—কেমন বিগড়ে যেত ; সেদিন কিছুতেই ওই হালিম-দবিরদের সঙ্গে যেতে পারতাম না ; ইচ্ছে হত না। নানীর সঙ্গে ঝগড়ার সময়টাই ছিল রাত্রিতে। রাত্রিকালে যখন বাড়ি ফিরতাম তখনই তো নানী বকতে শুরু করত। দুষ্টুমি করে বাড়ি ফিরতাম। আমার সাড়া পেলেই নানী বেরিয়ে আসত চীৎকার করতে করতে—আরে হারামজাদা বেজাত ছোটলোকের ছেলে, আমার হাড্ডিতে তুই কালি পড়ালি।

আমি চীৎকার করতাম—খবরদার বুড়ী ভঁইষী, নেড়ী কুত্তী, চুপ কর্ বলছি।

আরম্ভ হয়ে যেত ঝগড়া। মারপিট হয়ে শেষ হত। সে আমাকে পিটত, আমিও তাকে আঁচড়ে কামড়ে দিতাম, পেটে ঢুঁ মারতাম। সে পেট ধরে বসে কাঁদত, খোদাকে ডাকত, মরণকে ডাকত। বলত—ওই আপদকে নে, আমি বাঁচি। আমি কাঁদতাম না, গো ধরে বসে থাকতাম। কিন্তু সতর্ক থাকতাম। সামলে উঠে বুড়ি সটকার নল কি লাঠি ধরলেই আমি বের করব আমার চাক্কু। নানী কান্নাকাটি করে উঠে সাধারণত বলত—নিকাল্—নিকাল্ আমার বাড়ি থেকে। আমি বেরুতাম না, বসেই থাকতাম। তারপর বুড়ি ঠাণ্ডা হত। কিন্তু যেদিন সে ধরত লাঠি, আমাকে ছেঁচত, আমি চাক্কু বের করে তাকে তাড়া করতাম—সেদিন বুড়ি শেষ পর্যন্ত ঘরে ঢুকে খিল দিত। আমিও বেরিয়ে আসতাম ; কবরখানার পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে আড়াল দেখে কোন বাঁধানো কবরের ওপর শুয়ে থাকতাম। ঠিক করতাম, সকালে উঠেই চলে যাব কোথাও। এক সময় ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম না-আসা পর্যন্ত গুন-গুন করে গান গাইতাম। জন্মাবধিই গানের

গলা আমার ভাল। গানের ওপর একটা দখলও আমার জন্মগত। ফিল্মের গান, রেকর্ডের গান—শুনবামাত্র শিখে নিতাম।

এই কবরখানায় একদিন দেখা হল ফাদারের সঙ্গে।

চঞ্চল হয়ে উঠল জন সাহেব। গলিত বীভৎস চোখ দুটি থেকে জলের ধারা গড়িয়ে এল। বিমল নীরবে বসে রইল। মহানগরীর উপর নিশীথ রাত্রির কালো-কুহক-তখন শেষ রাত্রির চাঁদের আলোয় অপরূপ মোহিনী-কুহকে রূপান্তর গ্রহণ করেছিল। গাছপালা ঘর বাড়ির উপর ধীরে ধীরে শুভ্র শোভায় ফুটে উঠছিল জ্যোৎস্না। গভীর স্তব্ধতার মধ্যে এই রূপান্তর দেখে বিমলের মনে হল, যেন কঠিন অভিশাপে কৃষ্ণপ্রস্তরীভূতা কোন মোহিনীর শাপমোচন হচ্ছে। মনে পড়ল, গৌরাঙ্গিণী পরমাসুন্দরী অহল্যা একদা শাপগ্রস্তা হয়ে কঠিন কৃষ্ণ-প্রস্তরমূর্তিতে পরিণত হয়েছিল; মনে হল, রামের পাদস্পর্শে শাপ-মোচনের সূচনায় এমনি করেই তার প্রস্তরীভূত দেহের কালো রঙ মিলিয়ে গিয়ে সর্বাঙ্গে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল শুভ্র কোমল লাবণ্যময় বর্ণ-সুষমা।

(গ)

কিছুক্ষণ পর জন বললে, ফাদার আমার জীবনের স্বর্গীয় দূত, ভগবানের আশীর্বাদ।

আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, যদি অভিশাপ বল, তাতেও আপত্তি করব না। আমার জীবনটা সে-ই এমন করে দিয়ে গেল। ফাদার যদি না আসত আমার জীবনে, তবে কি ক্ষতি হত? চোর ডাকাত গুণ্ডা হয়েই জীবন কেটে যেত। ক্ষতি কি? কি ক্ষতি?

বলেই সে শিউরে উঠল। বার বার ঘাড় নেড়ে বললে, না না না।

তুমি আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে তুমি মার্জনা কর। ফাদার! মাই ফাদার! মাই ফাদার!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, একদিন রাত্রে সেই কবরখানায় শুয়ে ছিলাম নানীর সঙ্গে ঝগড়া করে, সেই দিন এই গান প্রথম শুনেছিলাম ফাদারের কাছে। যে গান এতক্ষণ আমি বাজনায় বাজাতে চেষ্টা করলাম—এই গান! ওঃ, সে কি মুহূর্তগুলি! সেদিন আকাশে জ্যোৎস্না ছিল না, গাঢ় অন্ধকার; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—সম্ভবত অমাবস্যার কাছাকাছি। আগস্ট মাস। আকাশে সেদিন ছিল ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ। ওপরের আকাশ যেন কালো পাহাড়ের মত ভাসছে। খুব ফিনফিনে ধারার বৃষ্টি, এলোমেলো বাতাসের ঝটকায় ভেসে ভেসে যাচ্ছে; দূরে পাঁচিলের ওপারে রাস্তার গ্যাসের আলোর সামনে সে বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, কুয়াসা উঠছে—ভেসে যাচ্ছে। একটা ঢাকা কবরের গম্বুজের নীচে ঠেস দিয়ে বসে ঠায় তাকিয়ে ছিলাম রাস্তার গ্যাসের আলোর ছটার দিকে। রাস্তায় তখন মানুষ ছিল না। সমস্ত শহর যেন সেদিন কালো হিমেল মেঘের পাহাড়ের আতঙ্কে হতচেতন। ওখানে বসে বুঝতে পারছিলাম। কোনও সাড়া শব্দ নেই কোথাও। শুধু বিজলী রোডের ওপর ট্রামের পাওয়ার হাউসে হাইভোল্টেজ ইলেকট্রিক কারেন্টের শব্দ উঠছিল—খোনা কোন অতিকায় জানোয়ারের গোঙানির মত। একটানা গোঙানি। কবরখানার দক্ষিণ-পূর্বের বস্তিতে দু-একটা কুকুর ঘেউঘেউ করে চেঁচাচ্ছিল; সম্ভবত মানুষের-দৃষ্টিতে-অদৃশ্য কোন আত্মাকে ওরা বাতাসের স্তরে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাচ্ছিল। কারণ মধ্যে মধ্যে যেন ভয় পাচ্ছিল কুকুরগুলো। আমার শরীরও ছমছম করছিল। ক্বচিৎ কখনও এক-আধখানা রবার-টায়ার ফিটন ট্রাম-লাইনের

পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছিল পার্ক স্ট্রীটের দিকে ; চাকার শব্দ উঠছিল না, উঠছিল ঘোড়ার খুরের শব্দ—খপ্-খপ্ খপ্-খপ্। আর উঠছিল, কোচমানের জিভের ডগায় তোলা ক্যা-ক্যা আওয়াজ তারই সঙ্গে চাবুকের আস্ফালনে বাতাস-কাটা শিসের মত শব্দ। হঠাৎ একখানা ফিটন যেন কাছেই কোথাও থামল। বর্ষার সেই ঠাণ্ডা অন্ধকারের মধ্যে আমার কানই শুধু কবরখানার বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছিল কিনা, নইলে সেদিন অন্ধকারে বাদলে আমি যেন হারিয়ে যেতাম। প্রতিটি শব্দের দিকে কান আমার সজাগ হয়ে ছিল। নইলে, গাড়িখানা থামা আমি জানতে পারতাম না। চোখ তখন বুজে আসছিল। গ্যাসের আলো হারিয়ে যাচ্ছিল।

তারপর হঠাৎ উঠল এই গান। এই যন্ত্রটাতেই গান বাজিয়েছিল। অকস্মাৎ এমন রাত্রিতে সেই দুপহরে এই গান শুনে আমি পাথর হয়ে গেলাম। বিশ্বাস কর, বুকে জেগে উঠল এক অবর্ণনীয় উদ্বেগ, আতঙ্ক, বেদনা। মনে হল, কবরখানার সমস্ত কবরের মুখ খুলে গিয়েছে, আর প্রত্যেক কবর থেকে মৃত মানুষেরা মাথা তুলে উঠে তাকাচ্ছে, তারা কাঁদছে। দুটো মরা চোখ থেকে নেমে আসছে জলের দুটি ধারা। মনে হল, গাছ কাঁদছে, পাতা কাঁদছে, মাটি কাঁদছে, বাতাস কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বাস কর তুমি, আকাশ ভেঙে মেঘেও বৃষ্টি নামল সেই সময়। বিদ্যুৎ নেই, গর্জন নেই—শুধু ঝরঝর ধারায় বর্ষণ। তার সঙ্গে সেই গান। গান নয়, কান্না। যেন পুত্রশোকাতুরের বুক-ফাটানো কান্না। আর সেই কান্নায় মরা মানুষেরা জেগে উঠে কাঁদছে, বলতে চাইছে—আঃ, এত ভালবাসতে তোমরা? হায়, আমাদের যে ভাষা নেই—স্পর্শ নেই—রূপ নেই ; কি করে তোমাদের সান্ত্বনা দেব?

কেমন করে চোখের জল মুছিয়ে দেব, কি করেই বা দেখা দেব? আমার মনে হল, আমি যে কবরটার ওপর বসে আছি সেটার তলা থেকে মৃত মানুষটা আমাকে ঠেলছে। বলছে—সর, ওঠ, আমি উঠব। ওই গান শুনব। বিশ্বাস কর তুমি। গাছের পাতায় পাতায় বাতাসে ফিসফিস করে শব্দ উঠছিল—হায় হায়। আমি স্পষ্ট শুনলাম। ভয়ে আতঙ্কে আমি চীৎকার করে লাফ দিয়ে পড়ে ছুটলাম। জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছিলাম, তার ওপর সেই অন্ধকার। একটা কবরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। চীৎকার করেছিলাম।

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

জ্ঞান হলে দেখলাম, কবরখানার ফটকের নীচে মিটমিটে আলোর তলায় দাঁড়িয়ে আছে ওই ফাদার। লম্বা মানুষ, মিষ্টি চেহারা, পরনে ঢিলেঢালা পোশাক, সর্বাঙ্গ ভিজে, বগলে এই বাদ্যযন্ত্রটা। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সে দৃষ্টিতে পরমাশ্চর্য মমতার মাধুর্য। মুহূর্তে স্পর্শ করে মানুষকে। কালো সাহেব। তা বলে আমার মত কালো নয়।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে বললে—ক্যায়সা মালুম হোতা, বাচ্চা? বেটা!

আমি কথা বলতে পারলাম না। থরথর করে কাঁপছিলাম। বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে, মাথায় একটা যন্ত্রণা, প্রচণ্ড শীত লাগছিল যেন। আমাকে কাঁপতে দেখে ফাদার দু হাতে আঁকড়ে বুক দিয়ে চেপে ধরলে। কবরখানার ফটকওয়ালাকে বললে—একঠো গাড়ি! মেহেরবানি করো ভাইয়া, একঠো গাড়ি! জলদি।

ফাদার পাদরী নয়;—সাধারণ একজন দেশী ক্রীশ্চান, তবে অসাধারণ মানুষ, অন্তত আমার চোখে তাই। তাকেই আমি ফাদার বলি; সে আমার সত্যই বাপ ছিল। বাপের স্নেহ পেয়েছি তার কাছে। সেই আমাকে বাঁচিয়েছে। আমার উপার্জনের পথ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, জীবনে ঈশ্বরের নামই শুনেছিলাম। সে কে? কি?—তা নিয়ে কোন অন্বেষণ আমার জীবনে ছিল না; একটা পয়সার জন্য, একটা বিড়ির জন্য, তাই বা কেন—নিছক তামাশার জন্যও ঈশ্বরের নামে শপথ করে মিথ্যে কথা বলতাম। ফাদারই আমাকে বুঝিয়েছিল, বোঝাতে চেয়েছিল—ঈশ্বর কি, ঈশ্বর কে! তাই সে আমার ফাদার।

ফাদার ছিল সঙ্গীতজ্ঞ—সুরকার। বাজনা বাজাত সে। পিয়ানো ব্যাঞ্জো গীটার—সব তাতেই ছিল আশ্চর্য ওস্তাদ। অপেরাহাউসে, অর্কেস্ট্রা-পার্টিতে বাজনা বাজাত। সিনেমা-কোম্পানির ছবিতোলার কাজেও পিয়ানো বাজাত। টাকা তার প্রচুর ছিল না, কিন্তু অভাব ছিল না। অদ্ভুত মানুষ, বাড়িতে একা। কতকগুলো পাখি, কুকুর, একটা বেড়াল, দুটো বাঁদর নিয়ে তার সংসার। আর ছিল দুটো ছাগল। দুধ দিত অনেক। তারই মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম। রুগ্ন অসুস্থ।

সেদিন রাত্রেই আমার জ্বর এল। মৃত্যুরোগের মত কঠিন জ্বর, একাদিক্রমে চল্লিশ দিন। জ্বরের ঘোরের মধ্যেও কানে আসত গীটার কি ব্যাঞ্জোর টুং-টাং শব্দ। আমার শিয়রে বাজনা হাতে নিয়ে ফাদার বসে থাকত, মৃদু ধ্বনি তুলে বাজনা বাজাত আপন মনে আর আমাকে লক্ষ্য করত।

দারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার করতাম—নানী—নানী! ফাদার যন্ত্র রেখে কাছে এসে মাথায় হাত বুলোত, হাওয়া করত। পিপাসায় কাতর হয়ে চাইতাম পানি।

ফাদার এসে মুখে জল দিত। তারপর আবার গিয়ে চেয়ারে বসে যন্ত্রটি তুলে নিত। মৃদু যন্ত্রধ্বনি উঠত, টুং টুং—টুং টুং।

সন্ধ্যের দিকে ফাদার থাকত না। সিনেমায় কি অপেরার বাজনা বাজাতে বেরিয়ে যেত। তখন আসত একজন নার্স। আমার আরামের জন্য ফাদার বাকি কিছু রাখেনি। এ আরাম, এ সেবা আমার জীবনে নতুন; সেই বস্তিতে নানীর সেই একখানা খুপরির ভিতরে জঞ্জালের মত রাশিকৃত জিনিসের মধ্যে ময়লা দুর্গন্ধওয়ালা বিছানায় যার কাল কেটেছে, এ আরাম তার কাছে স্বর্গের আরাম। কিন্তু তবু আমার অস্বস্তির সীমা ছিল না। শুধু ঘুমের মধ্যে আরাম উপভোগ করতাম! জেগে উঠলেই অস্বস্তিতে অশান্ত হয়ে উঠতাম। বুকের মধ্যে মনে হত, আমার আত্মার যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, কি যেন এক বন্ধনে সে বাঁধা পড়ছে। ফাদারের দৃষ্টি, এই আরামপ্রদ পরিচ্ছন্ন ঘর-দোর, বিছানা, সেবা—সব যেন বলত এর জন্য কঠিন মূল্য দিতে হবে আমাকে। সব চেয়ে এই যন্ত্রণা অনুভব করতাম ফাদার যখন সত্যি-সত্যি বাজনা বাজাত তখন। সুরের ঝঙ্কারে ঘর ভরে উঠত, মাথার উপরে নীল ইলেকট্রীক আলো যেন কেমন সবুজ হয়ে যেত, ঘুরন্ত পাখার সোঁ-সোঁ শব্দের মধ্যে মৃদু গানের ধ্বনি উঠত; মানুষের শিরার মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের মত আমার লোহার খাটের ডাণ্ডার বাজুতে সে ধ্বনি যেন সঞ্চরণ করে বেড়াত। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত সে বাজনায়; এ কি বাজনা! এ কি গান! গানে আমার জন্মগত দখল। সিনেমায় গান শুনেছি—শিখেছি, গেয়েছি।

সে গানে শরীরের প্রতি অঙ্গটি দুলে ওঠে, বুকের ভিতরটা উল্লাসে সিটি মেরে ওঠে, পায়ের তলায় নাচ জেগে ওঠে। হা-হা হেসে গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে যায় ; দুনিয়াটাকে সাবানগোলা জলের রঙিন ফানুষের মত উড়িয়ে দিয়ে হাওয়ায় উড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

আর, এ গান! গভীর গম্ভীর দীর্ঘায়িত সুরের একটি ঊর্ধ্বমুখী ধারা। লম্বা টানা সুর কোন্ ঊর্ধ্বলোক থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে চলেছে।—বিন্দু থেকে সিন্ধুর প্রসারে ব্যাপ্ত প্রসারিত হয়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে স্তব্ধতা। ছেদ পড়ছে, থেমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে, পৃথিবীই যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল ;—আসীম শূন্যলোক যেন গ্রাস করে নিলে সমস্ত সৃষ্টিকে, তার সঙ্গে আমিও বিলুপ্ত হয়ে গেলাম। আবার পিয়ানোয় ঘা পড়ছে, ঝঙ্কার উঠছে, মনে হল, অসীম শূন্যতাকে বিদীর্ণ করে জেগে উঠল আলোকদীপ্তি। জ্যোতির জাগরণ হল। ফাদারের চোখ দিয়ে জল পড়ত। দৃষ্টি তার দেওয়ালে-ঝুলানো ক্রুশে-বিদ্ধ ক্রাইষ্টের দিকে। গান থেমে যেত, বাজনার ঝঙ্কার তখনও ঘরের বায়ুস্তরে বেজে চলত ;—কানে শোনা যেত না, কিন্তু বুকে তার স্পর্শ লাগত। স্পর্শেন্দ্রিয় অনুভব করত, লোহার খাটের বাজুতে হাত রেখে বুঝতে পারতাম ; কিন্তু আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। মনে হত,আমি হারিয়ে যাচ্ছি, আমি ডুবে যাচ্ছি! আমার বুকের মধ্যে কে যেন বলত —সর, ওঠ ; আমি যে শুনব ওই গান। সেই কবরখানায় কবরের তলায় মানুষটার যে কথা ফিসিফিসিয়ে ভেসে উঠেছিল সেদিন অন্ধ-কার রাত্রির বর্ষার বাতাসে, গাছের পাতার খসখসানিতে—সেই কথা ঘরের বাতাসে বেজে উঠত। বিশ্বাস কর তুমি; কঠিন রোগের শেষে অনুভূতি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ;—সেই অনুভূতিতে আমি স্পষ্ট শুনেছি এই কথা ;—আমারই বুকের ভিতর থেকে কেউ বলত।

আমি সহ্য করতে পারতাম না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। চীৎকার করে কাঁদতে গলায় আওয়াজ বের হত না। মনে মনে ডাকতাম নানীকে—নানী, নানী, আমায় নিয়ে যা। নিয়ে যা এখান থেকে। নইলে আমি বাঁচব না।

ঠিক এই জন্যই, এই অসহনীয় উদ্বেগের জন্য ওই আরাম আমার অসহ্য হয়ে উঠল। একদিন আমি পালালাম। তখনও আমি সম্পূর্ণ সারি নি; মুর্গীর সুরুয়া খেয়েছি, রুটি কি কোন শক্ত খাবার তখনও পেটে পড়ে নি। একদিন ফাঁক পেয়ে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নানী, আমার নানী! নানীর বাড়িই আমার ভাল। যদি দোজখ হয় তবে দোজখই আমার ভাল—বেহেস্ত আমি চাই না। সেখানে আমি বাঁচব না। আমি মরে যাব। হালিম, দবির, রহমন—এদের নইলে জীবনে আমার আনন্দ কোথায়? সুখ কোথায়? ওই গান আমি সহ্য করতে পারব না। আমার বুকের ভিতরটা ফেটে যাবে। আমি যে শুনেছি, বুকের ভিতরে ওই গান শুনে. কে বলে—ওঠ, সর, আমি ওই গান শুনব। ভয়ে পালালাম।

রাস্তায় দশবার বসে কোন রকমে এসে পৌছুলাম বেনিয়াপো-খোরে। আশ্চর্য! এই ক-দিনেই বেনিয়াপোখোরের বস্তির একটা গন্ধ এসে আমার নাকে লাগল। তোমাকে কি বলব? মনে হল ফিরে যাই, এখান থেকেই ফিরে যাই। ফিরে যাই কাদারের বাড়ি।

হাসল জনি সাহেব।

বললে, আমার বুকের ভিতরে কবর যে তখন ফেটে গেছে। জন্ম থেকে জীবন্ত যে ছিল কবরের ভিতর পোঁতা, সে যে মাথা তুলেছে। কিন্তু—। আবার হাসল জনি।

—কিন্তু সে তো সংসারে সহজ নয়। আমি তাকে ফের কবর

দিতে চেয়েছিলাম বলেই পালিয়ে এসেছিলাম বেনিয়াপোখোরের বস্তিতে। বস্তির গলি থেকে ছুটে এল হালিম আর দবির। তারাই বা তাকে উঠতে দেবে কেন? আমার হাত চেপে ধরলে।

(৬)

—বাচ্চি!

আমার নাম ছিল তখন বাচ্চি।

রহমন বললে—এ কি চেহারা হয়েছে তোর? কোথায় ছিলি এতদিন?

হালিম কিন্তু হাত ধরে টানলে, চাপা গলায় বললে—আবে, চলে আয়। আর কেউ দেখবার আগেই চলে আয়। জলদি।

—কেন? আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

—শুনবি, পরে শুনবি। এখন—। টেনে ঢোকালে একটা গলিতে। এঁদো-গলি, ভয়ানক গলিপথ। সেই সংকীর্ণ গলির ভিতর একটা নির্জন পড়ো ঘর। অন্ধকার। সেখানে নিয়ে গিয়ে বললে—পুলিস তোকে খুঁজছে।

—পুলিস খুঁজছে? কেন?

—তোর নানীকে তুই খুন করেছিস।

—আ—মা—র—না—নীকে? খু—ন? আ—মি?

—হ্যাঁ। তু বে তো নানীকে খুন করেই পালিয়েছিলি। সেই রাত্রি থেকেই তো তুই ফেরার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে হালিম তাকিয়ে রইল। পৃথিবীটা তখন কাঁপছে—দুলছে; কালো হয়ে যাচ্ছে। আমি কাঁপতে

কাঁপতে বসে পড়লাম। ওই এঁদো ঘরটার মধ্যে সারা দুনিয়াটা যেন কুঁকড়ে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল।

এবার চুপি-চুপি হালিম বললে—তুই আজই চলে যা—পাটনা কি ইলাহাবাদ, দিল চায় তো দিল্লীই চলে যা। খরচ মওজুদ আছে। পুরা শও রূপেয়া। নে, নিয়ে পালা।

দবির বললে—নসীবের মেহেরবানি রে বাচ্চি, কি, বস্তি ঢুকবার মুখে পহেলেই আমাদের চোখে তুই পড়েছিলি! দুসরা কারও নজরে পড়লে কি হত বল্ তো? একদম ফাঁস্সী।

আমি বসে রইলাম। আমার মাথার ওপর যেন প্রচণ্ড একটা লোহার ডাণ্ডার ঘা পড়েছে। কথা বলতে পারলাম না, হাত পা নাড়বার শক্তি আমার হারিয়ে গেল, চোখ আমার বন্ধ হয়ে এল; বসেই আমি টলতে লাগলাম।

নানী নাই! নানীকে খুন করেছি আমি!

মোটা থলথলে-দেহ নানীকে যেন আমি চোখে দেখতে পেলাম। রক্তে মেঝে ভেসে গিয়েছে, নানী তারই মধ্যে পড়ে আছে রক্ত মেখে। শুনতে পেলাম, ছুরি খাবার সময়ে নানী—মেরেছে ওই হালিম দবির, তাতে আমার সন্দেহ নেই—তখন নানী আমাকে ডেকেছিল বাচ্চি —বাচ্চি—ওরে বাচ্চি।

আমি মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম। হালিম দবিরই আমাকে ধরলে। আমি এক লহমায় বুঝে নিলাম যে, নানীকে মেরেছে ওই হালিম দবির।

হালিম দবির অনেক দিন আমাকে বলেছে—বাচ্চি, তোর নানীর অনেক টাকা। মিট্টির তলায় গাড়া আছে, আমরা জানি। একদিন ওকে সাবাড় করে দিয়ে চল্, টাকা নিয়ে আমরা ফুর্তি করে আসি। চলে যাব লাহোর কি লক্ষ্ণৌ কি বম্বাই। কে পাত্তা পাবে?

সে কথা বলতে কিন্তু সাহস হল না আমার।

হালিম কসাইয়ের ছেলে, বাপের দোকানে বসে চপার দিয়ে সে মাংস কাটে। বড় বড় খাসি, গরুর টাঙানো লাশের ভেতর ছুরি চালিয়ে একটানে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে এক-একটা অঙ্গ। চোখে তার খুন ঝিলিক মারে।

হালিম আর এখন বেঁচে নেই, না হলে দেখাতাম চোখে খুন কেমন করে ঝিলিক মারে। যদি কখন কোন মানুষকে দেখ, রাগের মধ্যেও স্থির হয়ে আছে, মুখের একটি পেশীও নড়ছে না, শুধু চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছে, ওপরের চোখের পাতার নীচে তারা দুটি নিস্পন্দ স্থির হয়ে আছে, তবে জেনো সেখানে খুন খেলা করছে। লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারবে, তারা দুটি আসলে স্থির হয়ে নেই ; ভেতরে ভেতরে কিছু যেন জ্বলছে আর নিবছে! রাত্রে বেড়ালের চোখের সামনে আলো তুলিয়ে দেখো—তারা দুটো একবার ছোট হবে একবার বড় হবে। হালিমের স্থির চোখের তারার ভেতরে খুন এমনি করে খেলা করত।

হালিম হেসে বললে—থাক্, ঘরের অন্দরে শুয়ে থাক্ চুপ করে। সন্ধ্যের সময় তোকে চড়িয়ে দেব দিল্লীর গাড়িতে। আমাদের কথা মাফিক চললে কোনও ডর নাই তোর।

চলে গেল তারা। দরজা বন্ধ করে শেকল লাগিয়ে দিলে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমি পড়ে রইলাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। ডাকলাম নানীকে, ডাকলাম ফাদারকে।

এক সময় অসহ্য মনে হল। পালাতে আমাকে হবে ; পালাতেই হবে। নইলে আমাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবে নয়তো

আমাকে ওরা খুন করবে। নইলে আমাকে দিয়ে যা-খুশি করাবে। আমার নানীকে ওরা খুন করেছে, তার সর্বস্ব নিয়েছে, ওদের প্রতি বিতৃষ্ণায় রাগে আমার মন আগুন হয়ে উঠল। ভয়ে পাগল হয়ে গেলাম। ওদের কাছ থেকে পালাতে হবে আমাকে।

বস্তির ঘর ; বাঁশের বেড়ার উপর মাটি লেপন দেওয়া দেওয়াল। সে ভাঙতে দেরি লাগে না। কিন্তু আমার দুর্বল শরীরে সময় খানিকটা লাগল। বেরিয়ে পড়লাম। গলি গলি ছুটলাম। এসে যখন বড় রাস্তায় পড়লাম, তখন বিকেলবেলা। একটা বড় বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিল, আমার জ্বর আসছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল বাজনায়। আমার পায়ের নখ থেকে রক্ত সনসন করে উপরের দিকে উঠছিল তখন—ওই বাজনার শব্দে। তাতেই ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল সেই বাজনা, ফাদারের বাজনা। কিন্তু না, কাছেই গির্জেতে বাজছিল। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটি মেয়ে গান গাইছিল। তুমি নিশ্চয় শুনেছ ইংরেজ মেয়ের গান—জান তাদের সুরের ভঙ্গি, কেমন টানা আর কত সরু সুরেলা! যখন উঁচু গ্রামে কাঁপিয়ে সুর টানে, তখন মনে হয় ওই গানের একটি অংশ তীরের মত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ছুটছে আকাশ ভেদ করে, খাদের অংশটা ঘুরে বেড়ায় মাটির বুক ঘেঁষে।

সেদিন আমার ঘুমের ঘোরে মনে হল, বাজনা বাজাচ্ছে ফাদার, সেই বাজনা। আর নানী—কবর থেকে জেগে ওঠে বুকফাটা কান্না কেঁদে আমাকে ডাকছে।

চুপ করলে জনি।

একটু ভেবে নিয়ে বললে—আজ তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু সেদিন ঠিক তাই মনে হয়েছিল কি না বলতে পারব না। হয়তো হয় নি। কিন্তু মনে পড়েছিল—ফাদারকে আর নানীকে আমার মনে পড়েছিল। ফাদারের বাড়িতে বাজনা শুনে যেমন শ্বাসরোধী কষ্ট হত, বুকের ভেতর কবর ফাটিয়ে যেমন কেউ উঠতে চাইত, যেমন যন্ত্রণা হত, তাই হল। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। উঠে পাগলের মতই হাঁটতে শুরু করলাম। গেলাম থানায়। বললাম—আমিই বাচ্চি শেখ। আমি কিন্তু নানীকে খুন করি নি, খুন করেছে হালিম দবির।

বললাম সব বিবরণ। তারা আমাকে গ্রেপ্তার করলে। হালিম দবিরকেও। খবর পেয়ে ফাদার এল ছুটে।

(চ)

ফাদারই আমার বিপদ কাটিয়ে দিলে। ফাদারের বাড়িতে আমি জ্বরে বেহোঁশ হয়ে পড়ে ছিলাম, সেই সাক্ষী দিলে ফাদার। হালিম আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। নানীকে ওরা খুন করেছিল—আমি চলে আসার পরের দিন। আমার জন্মে চীৎকার করে বুড়ী সারাদিন কেঁদেছিল। হালিমের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, ভেবেছিল তারাই আমাকে লুকিয়ে রেখেছে। হালিম এ সুযোগ ছাড়ে নি। আমি নেই, ফেরার হয়েছি। সুতরাং সহজেই খুনের দায় আমার ঘাড়ে পড়বে। রাত্রে তারা নানীকে খুন করেছিল।

তবু কিন্তু হালিমরা খালাস পেয়ে গেল। জানা গেল সব, কিন্তু প্রমাণ হল না। হালিম খালাস পেয়ে বললে—এবার তুই।

সেদিন আমি ভয় পাই নি। কেন ভয় পাব? আমি আবার তখন ফাদারের আশ্রয়ে ফিরে গেছি।

আর আমার বুকের ভিতরটা তখন ফেটেছে। জীবনের

পাপের তলায় চাপা-পড়া আমার আত্মা জাগতে চাচ্ছে—উঠতে চাচ্ছে। ফাদারের ওই গান—ওই বিচিত্র গান—তাকে ডাক দিয়েছে। আত্মা যখন জাগতে চায়, জাগে, তখন কোনও ভয়ই তাকে অভিভূত করতে পারে না। তার ওপর আমার ফাদার আমার সামনে।

ফাদার ছিল বিচিত্র মানুষ। গান-পাগল। সুর সে আবিষ্কার করত। প্রথম যৌবনে মারা গিয়েছিল তার স্ত্রী আর শিশুপুত্র। তারপর থেকে দিনরাত্রি সাধনায় ওই সুর সে আবিষ্কার করেছিল। বুক-ফাটানো কান্নার সুর, সে সুরের ঝঙ্কার বাতাসের স্তরে মিশলে বাতাস কাঁদে, আকাশে ছড়ালে আকাশ কাঁদে, পৃথিবীর মাটিকে স্পর্শ করলে মাটি কাঁদে, মাটি ফাটে। ফাদার তাই গাঢ় অন্ধকার রাত্রে যেত কবর-খানায় এই গান বাজাতে। এই সুরে সে কবরের তলায় সমাহিত আত্মাদের জাগিয়ে তুলবে। কবর ফাটবে, তার ভেতর থেকে তার স্ত্রী আর ছেলে জেগে উঠে দেখা দেবে, কথা বলবে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে দুর্যোগ নামলে আসত সেই বাজনা বাজাবার রাত্রি। এমনি রাত্রেই তারা মারা গিয়েছিল। তা ছাড়া সমস্ত পৃথিবী মূর্চ্ছাহত না হলেই বা তারা জীবনের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে কি করে?

কবর থেকে আত্মা জাগে। সে তোমায় আমি বলেছি। অবিশ্বাস করো না। আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ওই গানে তারা জাগে; কথা বলতে পারে না, মরা চোখে কাঁদে আর কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, মানুষের বুকের মধ্যেও জাগে। যে আত্মা জাগ্রত, সে ঈশ্বরমুখী হয়; যে আত্মা ঘুমন্ত, তার ঘুম ভাঙে; যার আত্মা শয়তানের হাতের চাপানো পাথরে তলায় সমাহিত, তার আত্মা প্রাণপণে ওই পাথরকে ফাটিয়ে ওপরে উঠতে চায়, বলে—সর, ওঠ; আমি উঠব, ওই গান শুনব।

আমার বুকে আমার আত্মা শয়তানের পাথরে চাপা পড়ে ছিল সেই শৈশবে, হয়তো বা জন্মাবধি। ওই গানে পাথর ফাটল। সে জাগতে চাইল, সে উঠতে চাইল।

কিন্তু এ বড় যন্ত্রণা বন্ধু। মর্মান্তিক যন্ত্রণা। সহ্য হয় না। অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও বোধ হয় বেশি। বুকের ভেতরটা যেন অহরহ মোচড় খায় আপনা-আপনি—কার্বলিক অ্যাসিডে পোড়া সাপের মত।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জনি বললে, কিন্তু এর একটা বিচিত্র আস্বাদ আছে, সে স্বাদ যত মধুর তত তীব্র। সঙ্গে সঙ্গে ভয়—সে এক ভীষণ ভয়! মনে হয়, হয়তো আমার আমিই হারিয়ে যাব। কিন্তু ভয়েরও পার থেকে অভয়ের ডাক আসে। তাই একে ছেড়ে যাওয়া যায় না। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু পালানো যায় না। আমি পারি নি।

ফাদার আমাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষিত করলে; নাম দিলে—জন। আমার গানের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পেয়ে একেবারে উল্লাসে উৎসাহে আত্মহারা হয়ে গেল। জান, আমার কথা শুনে আমার সুকণ্ঠের পরিচয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে গিয়ে পিয়ানোর ডালা খুলে ঝন-ঝন শব্দে আঘাত করলে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম—ওই ঝন-ঝনা মুহূর্তে সঙ্গীত হয়ে উঠল। হাউইয়ের অগ্নিশিখা ফেটে যেমন রঙিন ফুলঝুরিতে আকাশ ছেয়ে যায় ঠিক তেমনই।

(ছ)

আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জনি বললে, কিন্তু শয়তানের পাথর, তাতে আছে বিচিত্র যাদুশক্তি, ফেটেও আবার জোড়া লাগে। পৃথিবীর পাথরের মত মরা মাটি নয়।

আত্মা প্রলুব্ধ হলেই শয়তানের যাদুঘুম তার চোখের পাতায়

নামে ; চোখ বন্ধ হলেই, ঘুম এলেই মুহূর্তেই সেই সুযোগে শয়তানের ফাটা পাথর বেমালুম জোড়া লেগে, তাকে আবার কবরস্থ করে।

এমনই একটা দুর্বল মুহূর্তে আমার বুকে শয়তানের পাথর আবার জোড়া লাগল। আত্মা চাপা পড়ল। আমি ফাদারের আশ্রয় থেকে আবার পালালাম। শয়তান আমাকে ডেকে নিয়ে গেল হাতছানি দিয়ে। বছর তিনেক পর ঘটল ঘটনাটা। তখন আমি সন্থ যুবা ; আঠারো বছর পার হয়েছি ; শয়তান সামনে দাঁড়াল—এক হাতে মদের গেলাস, এক পাশে তার লাস্যময়ী তরুণী। আমি অধীর হয়ে উঠলাম হঠাৎ একদিন ধৈর্যের সকল ঠেকা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সেদিন ছিল আর এক দুর্যোগের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অমাবস্যার দু-তিন দিন বাকি আছে। ঘনঘটাচ্ছন্ন মার্চ মাসের রাত্রি। শীতের শেষে যে বাদল নামে, সেই বাদল নেমেছে। কনকনে শীতে জলো বাতাস বইছে—প্রেতলোকের দীর্ঘনিশ্বাসের মত। গভীর রাত্রে ঝিঁঝিরা অবিশ্রান্ত ডাকে, কিন্তু সেদিন তারাও চুপ হয়ে গেছে। প্রেতলোকের হিমানী-শীতল দীর্ঘনিশ্বাসের স্পর্শে তারাও বোধ হয় চেতনা হারিয়েছিল। রাস্তায় কাদা, মধ্যে মধ্যে জল জমেছে পথে। গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে সে বাতাসে। চারিদিকের আলো ঝাপসা ; কুয়াশা জেগেছে বর্ষণের পরে। মুখের চামড়ায় কুয়াশার স্পর্শ লাগছে বরফের স্পর্শের মত। জ্বালা করছে। তারই মধ্যে জেগে ছিলাম আমরা দুজন—ফাদার আর আমি। সন্ধ্যা থেকে ফাদার জানলা খুলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। অন্ধকার দেখছে, পৃথিবী মূর্চ্ছাহত হবে কখন, তারই প্রতীক্ষা করছে। আর আমি অধীর হয়ে জেগে রয়েছি, সুযোগ পেলেই বেরিয়ে যাব, বস্তির মধ্যে এক স্বৈরিণীর ঘরে গিয়ে উঠব। নারীদেহের উষ্ণ স্পর্শ

সর্বাঙ্গে মাখব। কিন্তু ফাদার ঘুমুচ্ছে না। হঠাৎ এক সময় ফাদার ডাকলে—জনি! ওঠ। জামা পোশাক পরে নাও। চল, যাব কবরখানায়। আজ যাব পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায়।

দেখছে পার্কস্ট্রীটের কবরখানা? পরিত্যক্ত শ্যাওলা-পড়া বড় বড় সমাধিতে ভরা—গাছের ছায়ায় ঘন অন্ধকার কবরখানা? সেই কবরখানা।

আমার বুকে তখন শয়তানের পাথরটা জোড়া লেগে আসছে। আমার চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় ছিল না। আশ্রয়দাতার হুকুম মানতেই হবে। মনে মনে গালাগাল দিয়ে উঠে এলাম। টাওয়ার-ক্লকগুলো বাজতে শুরু করল একসঙ্গে চারিদিকে—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। বারোটা বেজে গেল। তারপর আবার সব স্তব্ধ। পৃথিবী মূর্চ্ছা গিয়েছে।

পার্ক স্ট্রীটে যখন এলাম, তখন জুতোজোড়াটা ভিজে-কাঁথার মত দুঃসহ হয়ে উঠেছে। পায়ের আঙুলগুলো খসে যাবে বলে মনে হচ্ছে। হাতের আঙুলগুলো বেঁকে গেছে পকেটের মধ্যে। মুখের চামড়া অসাড়, পিন ফোটালেও বুঝতে পারি না।

ফাদার কিন্তু অদ্ভুত। তার এসব ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এই প্রেতপুরীর কবরখানায় ঢুকে যন্ত্রে সুর তুলল। সেই কান্নার সুর।

যন্ত্রের সুরে যেন বলছিল—কবরের তলায় কফিনের ভিতরে মৃত্যুঘুমে ঘুমন্ত ওগো আমাদের আত্মার প্রিয়জনেরা, তোমাদের হারিয়ে আমাদের এই বহুবিচিত্র পৃথিবীও শূন্য হয়ে গিয়েছে। আমাদের আত্মা কাঁদছে। সহ্য করতে পারছে না তোমাদর বিরহ। আজ এই গাঢ়-গভীর অন্ধকারে নিস্তব্ধ অবসরে তোমরা জাগ, তোমরা ওঠ। ওগো আত্মার আত্মারা, কথা কও, কথা কও।

ফাদারের গানের ভাষা আমি কোনদিন শুনি নি। তবে সুর শুনে এই কথাই মনে হত।

প্রথম দিনের মতই সেদিনও আমার মনে হল, কবরের মুখ খুলছে। কবর থেকে মানুষের আত্মারা মাথা তুলছে। নিষ্প্রভ চোখ চেয়ে রয়েছে।

আমার বুকের মধ্যে আমি অসহ্য উদ্বেগ অনুভব করলাম। বস্তির সেই মেয়েটির মুখও যেন দেখলাম ওই মৃত মানুষের মুখের সারির মধ্যে। ওঃ! তা ছাড়া এ কি অত্যাচার! এ কি নির্যাতন! এই অসহনীয় উদ্বেগ, এই শীতের মধ্যরাত্রে দারুণ দুর্যোগের মধ্যে এই কষ্ট—এ অসহ্য। মুক্তির জন্যে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। আমি যাব তার বাড়িতে; মদ্যপান করব, উষ্ণ দেহস্পর্শে অনন্ত সুখ অনুভব করব। কিন্তু পথ কই?

হঠাৎ ফাদার বললে—জনি, আমার কবরে এসে তুমি এই বাজনা বাজাবে। আমি নিশ্চয় সাড়া দেব। দেখো তুমি, আমার আত্মা জাগবে।

আমি পথ পেলাম, রূঢ়ভাবে মুহূর্তে বলে উঠলাম, না। না।

ফাদার চমকে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কি হল জনি? কি—না? কি বলছ তুমি?

আমি চীৎকার করে উঠলাম, আমি পারব না। আমি যাব না তোমার সঙ্গে। না—না—না। সঙ্গে সঙ্গে আমি উল্টো মুখে হাঁটতে লাগলাম। দ্রুতপদে। আমি পালাব। আমি পথ পেয়েছি। ময়দানের ওই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পালাব। গিয়ে উঠব সেখানে।

—জনি! জনি!—আমাকে অনুসরণ করলে ফাদার।

আমি জোরে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর ছুটলাম। এসপ্লানেডের দিকে। ফাদারও ছুটেছিল পিছনে—জনি! জনি! জনি!

আমিও বলে চলেছিলাম, না—না—না।

এসপ্লানেডের আলো পার হয়ে ময়দানের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাবার জন্য চৌরঙ্গী পার হয়ে ময়দানের দিকে ছুটলাম। চৌরঙ্গী রোড ধরে চলছিল একখানা চলন্ত ফিটন। ফিটনটার কোচ-বাক্স থেকে একটা লোক লাফিয়ে পড়ল। ছুটে এল আমার দিকে।

—কে? চমকে উঠলাম আমি।

—আরে শালা হারামী! গর্জন করে উঠল লোকটা।

সে হালিম। কোচবাক্সের ওপর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েছে; প্রতিহিংসাতুর চিতার মত লাফিয়ে পড়েছে।

তখন সে এসপ্লানেডে ফিটনের সঙ্গে ফিরত।

আজ এই নির্জন ময়দানে, দুর্যোগভরা এই মধ্যরাত্রে, আলোকিত চৌমাথায় আমাকে ময়দানের দিকে যেতে দেখে আমায় আক্রমণ করতে সে ছুটে এল। তাকে দেখেই মনে পড়ে গেল, তার সেই স্থির চোখের খুন-চাপা দৃষ্টি। আমি আর্ত চীৎকার করে ছুটলাম।

পিছন থেকে ফাদারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—জনি! মাই সন্! জনি!

(জ)

কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রের ময়দান দেখেছ? তার ওপর সেদিন ছিল দুর্যোগ। কবরখানায় এই রাত্রিতে বিষণ্ণ মৃত মানুষের অদৃশ্য দৃষ্টির মমতা-কাতর চাউনিতে মৃত্যুপুরীর স্পর্শ জেগে উঠেছিল; সেখানে

প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল, আতঙ্ক হয়েছিল। কিন্তু ময়দান, সেখানে খাঁ-খাঁ করছিল শূন্যতা, বড় বড় গাছগুলির তলায় তলায় অভিশপ্ত মৃত আত্মাদের দীর্ঘনিশ্বাসে জেগে উঠছিল পুঞ্জীভূত অদৃশ্য হিংসা। সেখানে গুমরে ফিরছিল নৃশংস রক্ততৃষ্ণা, লোলুপ লোভ। কবরখানা শান্ত রাত্রির বিষণ্ণ সমুদ্র। ময়দান ঝড়ে দুর্যোগে বিক্ষুব্ধ রাত্রির সমুদ্র। এখানে এ সময় যখন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে তখন জানবে, বিপন্নের কণ্ঠস্বর। ঝড়ের সমুদ্রে ডুবন্ত নৌকার নাবিকেরা যে চীৎকার করে, এ সেই চীৎকার। কিন্তু সাহায্য পাওয়া যায় না এমন সমুদ্রে। এমন রাত্রে ভগবান বিমুখ হন, পৃথিবী বধির হয়ে যায়।

আমি মহা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে সেদিন এমনি চীৎকার করেছিলাম। ভগবান বিমুখ, পৃথিবী বধির, শুধু আমার ভাগ্যে আমার স্নেহপরায়ণ ফাদার পিছন থেকে সাড়া দিলে—জনি, মাই সন্! জনি! দাঁড়াও—ভয় নেই। সমুদ্রতটের সন্ন্যাসীর মত সাড়া দিলেন।

কিন্তু দাঁড়াতে আমি সাহস পাব কোথা থেকে? পাপী হিংসায় অধীর হয়ে বাঘের মত, নেকড়ের মত, আক্রমণ করতে পারে—আর ভয়ে অধীর হয়ে শিয়ালের মত পালাতে পারে। মানুষের সাহস নিয়ে সে ফিরে দাঁড়াতে পারে না। আমি দাঁড়াতে পারলাম না, ভয় পেয়ে পালালাম, ছুটলাম। আর এক পাপী—হালিম হিংস্র বাঘের মত আমাকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছিল। আমাদের পিছনে অভয় দিয়ে সাহায্য করতে ছুটে আসছিল ফাদার। অন্ধকার গাছের তলা দিয়ে ছুটেছিলাম; অন্ধকারে আমি হারিয়ে যাই—অন্ধকারে আমি মিলিয়ে যাই। খেয়াল ছিল না, অন্ধকারের মধ্যেই থাকে বিপদ, অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অজানা অচেনা অদেখার প্রতারণা। সে প্রতারণাই করলে আমার সঙ্গে এই ময়দানের জমি আর

দুর্যোগের অন্ধকার। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা খালের মধ্যে আমি পড়ে গেলাম উপুড় হয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ঠিক পিছনেই উঠল একটা চীৎকার—আ—! হিংস্র উল্লাসের ধ্বনি। 'আ—' চীৎকার করে—হালিম আমার উপর লাফিয়ে পড়ল। আমিও আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই এসে পড়ল আমার ফাদার; পিছন থেকে হালিমের গরম জামাটার কলার চেপে ধরে হাঁকলে—খবরদার! হালিম ঘুরল। হালিম তখন সদ্য জোয়ান; চিতা বাঘের মতই ক্ষিপ্র এবং তেমনি হিংস্র। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চকিতের মধ্যে তার ছুরিখানা উঁচিয়ে তুলে পলকের মধ্যে বসিয়ে দিলে ফাদারের বুকে। ফাদার বৃদ্ধ, তবু তাকে একটা লাথি মারলে। হালিম ছিটকে পড়ল। ফাদারও পড়ল। ফাদার উঠল না। হালিম আবার মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল। আমিও তখন উঠেছি, কিন্তু সাহস নেই—ঠক-ঠক করে ভয়ে কাঁপছি। হালিম! সামনে আমার হালিম—কসাইয়ের ছেলে হালিম। আজ খুন শুধু চোখে নয়, তার সর্বাঙ্গে নাচছে। আমি তাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিয়েছি; শোধ নেবার জন্যে হালিম আল্লার নামে কসম খেয়েছে। শয়তান যখন আল্লার নামে কসম খায়, তখন সে কসমের তো লঙ্ঘন হয় না।

ফাদার তখনও পড়ে পড়েও চেঁচাচ্ছে—হেল্‌প! হেল্‌প! হেল্‌প।

হালিম পড়ল আমার ওপর ঝাঁপিয়ে। আমার ভাগ্য—হালিমের ছুরিখানা ফাদারের বুকে বসে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে কি? সে তার দুই হাতের আঙুলগুলো বেঁকিয়ে আমার গলা চেপে ধরতে চেষ্টা করলে। সাঁড়াশির মত চেপে ধরে মুচড়ে দেবে। আত্মরক্ষার প্রেরণায় আমিও তার দুই হাত চেপে ধরলাম। প্রাণপণ

জোরে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম। হঠাৎ এক সময় আমার হাত নুইয়ে হালিমের হাত দুটো নেমে এল ; গলায় পড়ল না, পড়ল মুখের উপর। নৃশংস হালিম, মুহূর্তে তার দাঁতগুলো হিংস্র হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। বললে—আব মিলা হ্যায়। আমি আতঙ্কিত হলাম ; কিন্তু বুঝতে পারলাম না, কি পেয়েছে সে ! গলা তো পায় নি ! তবে ? পর-মুহূর্তেই বুঝলাম। দেখলাম, তার দুই হাতের সব চেয়ে বড় আঙুল দুটো বেঁকে গিয়েছে বাঘের নখের মত ; আঙুলের ডগায় মেহেদী রাঙানো লালচে নখ, তারও প্রান্তে ময়লায় নীলচে বিষাক্ত ক্ষুরের মত নখের ধার। সেই নখ দুটো আমার দুই চোখের ওপর নেমে আসছে। নিঃশব্দ হাসিতে দাঁত বের করে হালিম আমার চোখে তার আঙুল বসিয়ে দিলে। সব অন্ধকার হয়ে গেল।

আতঙ্কে অভিভূত হয়ে বিমল অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, উঃ ! হে ভগবান !

(ঝ)

জন চুপ করলে। বিমল আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

শেষ রাত্রির এসপ্লানেড।

কৃষ্ণা দ্বাদশী অথবা ত্রয়োদশীর বাঁকা চাঁদ—পার্ক স্ট্রীটের উপর দিয়ে চৌরঙ্গী পার হয়ে আকাশের বুকে দাঁড়িয়েছে। পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে। স্বর্ণবর্ণ একটি শিশুদেহে যেন মৃত্যু সঞ্চারিত হচ্ছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মর্মর গম্বুজ পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় বেদনাকাতর, বিষণ্ণ। উদ্বেগকাতর আত্মীয়ের মত চাঁদের দিকে সে চেয়ে রয়েছে। গাছ-গুলির মাথায় মরা জ্যোৎস্না নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। চাঁদের কাছেই দক্ষিণাংশে শুকতারাটি শুধু ধকধক করে জ্বলছে।

জনি বললে, ঈশ্বরকে আমি জানি না, বুঝতে পারি না। ফাদার থাকলে আমি জানতে পারতাম—বুঝতে পারতাম ঈশ্বরকে। কিন্তু আমার অন্তরের শয়তান জন্মগত। সে-ই সেদিন চক্রান্ত করে নারীর মোহে মোহাচ্ছন্ন করে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল এই ময়দানে,—সেখানে হালিমের মূর্তি ধরে আমাকে আক্রমণ করেছিল। আমার আত্মাকে জাগাবার জন্য এসেছিল যে দেবদূত, তাকে সে হত্যা করেছিল। আমার আত্মা আর জেগে উঠতে পারলে না। তার অবস্থা কেমন জান? একটা মানুষকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। সমস্ত জীবন আর্তনাদ করছি—মুক্তি দাও; আমাকে হাত ধরে মাটি থেকে তোল। কিন্তু কে তুলবে?

ফাদার নেই, সে গান কে বাজাবে? পাথর কেমন করে ফাটবে?

তবে—

তবে ফাদার মৃত্যুকালে আমাকে বলেছিল।

দু-দিন পরে হাসপাতালে মারা গিয়েছিল আমার ফাদার। তার পাশেই রেখেছিল আমাকে। চোখ দুটো আমার গলেই গিয়েছিল। চোখের চিকিৎসার আর কিছু ছিল না। মৃত্যুকালে ফাদার আমাকে বলেছিল—জনি, জীবনে যখন ক্ষোভ হবে, যখন অতৃপ্তিতে মন ভরে উঠবে, তখন সেই গান বাজিয়ো, যে গান আমি দুর্যোগের রাত্রে বাজাতাম। আর পার তো, এই গান আমার আত্মাকে শুনিয়ো। এই বাজনার যন্ত্রটি আমি তোমাকে দিলাম। এই বাজিয়েই তুমি জীবিকা উপার্জন করতে পারবে।

হালিম ধরা পড়েছিল। তার ফাঁসি হয়েছিল।

হালিম মরেছে। কিন্তু শয়তান তো মরে না বন্ধু। সে আমাকে

কোমর পর্যন্ত কবরে পুঁতে রেখেছে। মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করে, মাথাটাকেও চেপে ওই কবরের মধ্যে পুঁতে দিতে। হঠাৎ এক-একদিন মনে মনে সেই উদ্দাম অতৃপ্তি জেগে ওঠে। চঞ্চল হয়ে উঠি। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করি। তখন যন্ত্রটায় আর সুর তুলতে পারি না। ওই রেস্তোরাঁটায় গিয়ে করিমকে জিজ্ঞাসা করি—এটা কি কৃষ্ণপক্ষ ?

করিম বলে—না, ওই তো আকাশে চাঁদ রয়েছে।

ছুটে গিয়ে ময়দানে বসি—উপর দিকে অন্ধ চোখ তুলে বসে থাকি। মনের আকাশে আমার চাঁদ ওঠে। ধীরে ধীরে মন শান্ত হয়। বাড়ি ফিরে যাই।

যেদিন করিম বলে—হ্যাঁ বাবাজান, এটা আঁধিয়ারা পক্ষ।

বুকের ভেতরটা সেদিন ধকধক করে ওঠে। জিজ্ঞাসা করি—চাঁদ উঠতে কত দেরি ?

করিম যদি বলে—ঘণ্টা ভর হবে।

তা হলে ঘণ্টা ভরই বসে থাকি রেস্তোরাঁয়। প্রাণপণ চেষ্টায় বসে থাকি। চাঁদ উঠলে তবে বাড়ি ফিরি।

করিম যদি বলে—চাঁদ এখন উঠবে কোথা ? উঠবে সেই শেষ রাত্রে।

সেদিন বুকের ভিতর ঝড় বইতে থাকে। মনে মনে ফাদারকে ডাকি। এক-একদিন ফাদারকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারি না। ফাদারের জায়গায় মনে পড়ে সেই স্বৈরিণীকে।

জান ? আপন মনেই অকারণে অসংলগ্নভাবে আমি বলে উঠি, না—না—না। পারব না, আমি থাকব না।

করিম ছুটে আসে। সে জানে, সেদিন আমি মদ চাইব।·বলে—বাবাজান, আজ ড্রিঙ্ক চাই ?

হ্যাঁ।

আমি মনে মনে ফাদারের কাছ থেকে ছুটে পালাই। ভাবি যাবই আজ সেই বস্তিতে। নিশ্চয়ই যাব।

মদ খেয়ে আমাদের গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরি। রিক্শয় চাপি সেদিন। বাড়ি যাই। পোশাক পাল্টে আরও টাকা নিয়ে যাব সেখানে। সারা পথ কুৎসিত চিন্তায়, বীভৎস কল্পনায় অধীর হয়ে উঠি। চীৎকার করে গান করি। কিন্তু ঘরে ঢুকেই ভয় পাই। ওই যে আমার কোমর পর্যন্ত মুক্ত আত্মা—আবার মাটির তলায় ঢাকা পড়বার আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে। মনে হয়, আমাকে হালিম তাড়া করেছে। ঘরের কোণেই সে লুকিয়ে ছিল। আমি ছুটে বেরিয়ে আসি। ছুটতে থাকি। ময়দানে এসে ছুটি—ছুটি—ছুটি।

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন খালে না পড়ি, ততক্ষণ ছুটি। খালে পড়লেই অভয় পাই। মনে হয়, মাটির তলা থেকে ফাদার আমায় বলছে—জনি, মাই সন্!

আর্তভাবে অস্ফুটস্বরে আমি বলি—আমাকে বাঁচাও ফাদার।

ফাদার বলে—সেই গান বাজাও জনি, সেই গান! আমি তা হলেই মাটি ঠেলে উঠতে পারব। তোমার আত্মা মুক্তি পাবে। সেই গান—

আমি বাজাই। সেই গান বাজে আমার যন্ত্রে।

মাটি কাঁদতে কাঁদতে ফেটে যায়।

বাতাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

গাছের পাতা কাঁদে।

আকাশ বোধ হয় কাঁদে।

আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে। আমি কাঁদি। চাঁদ ওঠে।

অথবা সকাল হয়ে আসে। পাখিরা ডাকে। আমার আত্মা নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করে। নেশা ছুটে যায়। ফাদারের হাতের স্পর্শ অনুভব করি।

আমি ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ি। মনে হয়, কোমর পর্যন্ত মাটিতে পোতা আমার আত্মার আরও খানিকটা বুঝি মুক্ত হল। খানিকটা মাটি বুঝি সরল। ক্রমে পাখিরা ডেকে ওঠে।

সেদিনও কলরব করে পাখিরা ডেকে উঠল।

আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। শুকতারা মিলিয়ে আসছে চারিদিকের পথে পথে গ্যাসের আলো নিবিয়ে বেড়াচ্ছে—কর্পোরেশনের লোকেরা। ইলেকট্রিক আলোগুলি নিবে গেল। জনি বললে, আমার হাতটা ধরে দয়া করে তুলবে?

পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে সে আত্মবিস্মৃতের মত বললে, ফাদার! মাই ফাদার!

বিমল হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু গুটিয়ে নিলে।

জনি নিজেই উঠল। যেন অদৃশ্য ফাদারের হাত ধরেই উঠল।

প্রহ্লাদের কালী

হোক না কেন খাঁচার বাঘ, বাঘ তো।

প্রহ্লাদ ভল্লা রুগ্ন, সেই কারণেই তাকে খাঁচার বাঘের সঙ্গে তুলনা দেওয়া। সুস্থ প্রহ্লাদ জঙ্গলের বাঘের মত ভয়ঙ্কর। বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু জঙ্গলের বৃদ্ধ বাঘও ভয়ঙ্কর।

তার শাবককে ধরে টান দিলে বৃদ্ধ জীর্ণ বাঘ যেমন হুঙ্কার দিয়ে নিষ্ঠুর ক্রোধে আততায়ীকে থাবা মারে, প্রহ্লাদের ঘরে তার মা-কালীর মূর্তিটির পিছন দিকে গিয়ে দারোগা মূর্তিটিকে স্পর্শ করবামাত্র প্রহ্লাদ ঠিক ওই বাঘের মতই একটা 'অ্যাও' শব্দে হাঁক মেরে, মারলে এক প্রচণ্ড চড়। রুগ্ন প্রহ্লাদের হাতের ঠিক ছিল না এবং দারোগা মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন তাই রক্ষা। চড় খেলে দারোগা ঘায়েল হতেন। প্রহ্লাদের চড়টা গিয়ে পড়ল সংকীর্ণ ঘরের দেওয়ালে।

মুহূর্তে দু-জন কনস্টেবল ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রহ্লাদকে ধরে ফেললে। মাথার ঝাঁকড়া চুল এবং বড় বড় জটা কয়েকটা আন্দোলিত করে পাগলের মত মাথা ঝাঁকি দিয়ে প্রহ্লাদ চীৎকার করে উঠল, চামড়া নিয়ে আমার কালীকে ছুঁলি! ওরে, চামড়া নিয়ে আমার মাকে ছুঁয়ে দিলি রে!

পায়ে জুতা, কোমরে বেল্ট, [illegible] চামড়ার খাপ বেঁধে দারোগা খানাতল্লাস করছিলেন। একই ঘরে দেওয়াল ঘেঁসে বেদীর উপর কালীমূর্তি, এক পাশে রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা কাপড়, এক কোণে কয়েকটা হাঁড়ি। প্রহ্লাদের এঁটো বাসন দেখে কালীমূর্তির পবিত্রতা সম্পর্কে এতটা অবহিত হন নি। তিনি চারিদিক দেখে শুনে কালী-

মূর্তির পিছনে গিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন, মূর্তিটির পিঠে কোন ঘুলঘুলি আছে কি না অর্থাৎ মূর্তিটা ফাঁপা কি না! সব অঞ্চলের চেয়ে এ অঞ্চলে এই কৌশলটা বেশি প্রচলিত। দিব্য একটি দেবমূর্তি, কিন্তু তার মাথাটি বা পেটটি ফাঁপা,—তার মধ্যে থাকে চুরি-ডাকাতির মাল, বে-আইনী গাঁজা চরস আফিং। ভারতবর্ষে সোমনাথের শিবমূর্তির মধ্যে নাকি লুকানো ছিল অজস্র মণি-মানিক্য রত্নসম্ভার! অন্যান্য দেশেও এর নজির আছে। কিন্তু এ অঞ্চলে রাধু রায়ের পর থেকে এই কৌশল বিস্তারলাভ করেছে বেশি। প্রহ্লাদের মত দুর্দান্ত লোক, এককালের দুর্ধর্ষ ডাকাত, জীবনে পত্নী গ্রহণ করেছে বারো-চোদ্দটি; তার মা-কালীর মধ্যে দেবত্ব আরোপ করতে কেউ চায় না, দারোগাও চান নি। মূর্তিটার পিঠে ফাঁকি এবং দেবতার মধ্যে ফাঁকি খুঁজছিলেন তিনি।

কনস্টেবলরা শক্ত করে বাঁধলে প্রহ্লাদকে।

দারোগা এবার কঠিন অবজ্ঞার সঙ্গে মা-কালীকে তল্লাস করলেন। জানালা নেই, আবছা অন্ধকার ঘর, টর্চ জ্বেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন, হাত বুলিয়ে দেখলেন, হাতের খাটো সরু লাঠিটা দিয়ে পেটে পিঠে মাথায় টোকা দেওয়ার মত ঠুকে কান পেতে শব্দ শুনলেন। তারপর শিবকে দেখলেন অনুরূপভাবে। কিন্তু শিব-কালী দুই নির্দোষ। খড় মাটিতে গড়া নিরেট নির্দোষ শিব ও কালী নড়াচড়ায় বিরক্ত প্রকাশ করলেন না, আঁকা চোখে পাতা পড়ল না, এমন কি লকলকে জিভেও কোন স্পন্দন জাগল না, শুধু কালীর হাতে দড়িতে বাঁধা অসুরের মুণ্ডটা একটু একটু দুলতে লাগল।

কোথাও কিছুই পাওয়া গেল না।

দারোগা এবার বললেন, নামাও কালী বেদীর ওপর থেকে।

মাটির বেদী, সেটাও ফাঁপা হতে পারে।

পারে নয়—ফাঁপাই। একটা ছোট গর্তও রয়েছে। গর্তটির মুখে একটি চওড়া-মুখ মেলিন্স ফুডের শিশির মুখ লাগানো রয়েছে।

দারোগা হেসে হাতের লাঠিটা পুরে চাড় দিলেন। ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে সরে এলেন দারোগা। ভিতরে একটি হাঁড়ি বসানো এবং তার মধ্যে একটা গোখরো সাপ। সাপটা আশ্চর্য নিরীহ, একবার মাথা তুলেই দিব্য শান্তশিষ্টের মত মুখটি কুণ্ডলীর মধ্যে গুঁজে হয় গর্জন করলে, নয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

একজন কনস্টেবল বললে, ওঃ, এটা সেই পোষা সাপটা!

ওদিকে হাত বাঁধা প্রহ্লাদ রক্তচক্ষে চেয়ে বসে ছিল, প্রথম বার-কয়েক চীৎকার করে সে চুপ করে গিয়েছিল। সেও একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে। পাওয়া কিছুই গেল না, তবু দারোগা তাকে ছেড়ে গেলেন না। সঙ্গেই নিয়ে গেলেন।

দারোগা, যাকে বলে, দুঁদে লোক। ইংরেজ আমলে তিনি অনেক দুষ্টকে শাসন তো করেছেনই, অনেক ভদ্র ব্যক্তিকেও এক হাত দেখিয়েছেন। তাঁর আপসোস, সেকাল আর নেই। অবশ্য এই কারণেই তাঁর প্রমোশন হল না, দারোগা হয়েই অবসর নিতে হবে। তা হোক, ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করতে পারেন না, সে দুষ্টেরই হোক আর ভদ্রেরই হোক। এখানে এসেছেন অল্প কিছুদিন। এসেই খোঁজ নিয়েছেন, কোথায় কে উদ্ধত জন আছে। অবশ্য এখন আর মাথাশক্ত ভদ্রলোকের দিকে নজর দেন না। এখন নজর দেন দুষ্টের উপর। দারোগাটি এদিকে সত্যই সৎ লোক, ঘুষ নেন না। তবে বাতিক ওই—উদ্ধত মানুষ সইতে পারেন না। দারোগা হয়েও চার-চারটে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেনা করেছেন তিনি। এখানকার ক্রাইম

আর ক্রিমিন্যালদের তালিকার মধ্যে দুটি নাম তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ঘনশ্যাম দাস আর প্রহ্লাদ ভল্লা।

ঘনশ্যাম দাস অ্যাবস্কণ্ডার।

পঁচিশ বছরের তাজা জোয়ান। লম্বা ছ ফিট; খাড়া নাক। দুর্দান্ত শক্তিশালী, দুরন্ত সাহসী। এ অঞ্চলের শতকরা আশিটি ক্রাইমের নায়ক। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় আছে, ডাকাতিতে আছে, লুঠেও আছে। আদর্শ নেই, উল্লাস আছে। সে নিজের ভাগ নিয়ে সরে যায়। ছোরা, লাঠি, সড়কি, একটা ভাঙা বন্দুকও তার আছে। কিন্তু সে ফেরার। তার পিছনে আই-বি সি-আই-ডি ঘুরছে। কবে কোথায় সে থাকে, কেউ বলতে পারে না। পলিটিক্যাল অর্ডিনারী দুই পথেই তার আনাগোনা।

আর প্রহ্লাদ প্রাচীন নায়ক। বৃদ্ধ ব্যাঘ্র।

দারোগা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, দুইকেই তিনি দমন করবেন।

বুড়ো বাঘ আর নতুন বাঘে দেখা হয় না। এ কি হয়? নিশ্চয় হয়। হয় নতুন বাঘটা আসে, পুরানো বাঘটা সস্নেহে তার গা চাটে। নয় নতুন বাঘে পুরানো বাঘে দেখা হয়। দুটোতে গর্জায়। কখনও দু চারটে থাবা বিনিময় হয়, সরে যায়। বুড়ো বাঘটা নিশ্চয় খবর জানে।

তাই সর্বাগ্রে ওই প্রহ্লাদকে নিয়ে পড়লেন।

প্রথমে একদিন বেড়াবার ছল করে লোকটিকে দেখে এলেন। থানার খাতায় প্রহ্লাদের ইতিহাস পড়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দেখলেন, গ্রামের প্রান্তে একেবারে মাঠের ধারে দুচালা লম্বা একখানা ঘর। সামনে খানিকটা ভিজে-রক অর্থাৎ খোলা বারান্দা। সবই অবশ্য মেটে। নিকানো উঠানে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা। ঘরের মধ্যে একটা কালীমূর্তি। লোকটার সংসারে কোন লোকজন

নেই। একা বসে আছে, বিড়বিড় করে বকছে, আর অনবরত দাঁতে দাঁত ঘষছে। মাথায় খুব লম্বা নয়, কিন্তু আশ্চর্য শক্ত কাঠামো। বয়স সত্তরের কাছে, এখনও বুকের হাতের পেশীগুলি জমাট বেঁধে অটুট অক্ষুণ্ণ রয়েছে। উপরের চামড়াটা একটু শিথিল এবং রুক্ষ হয়েছে শুধু। একমাথা রুক্ষ চুল—তার মধ্যে গোটা-চারেক জটা। দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন মুখ। গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। অনবরত লোকটা দাঁত কটকট করে কৃমিরোগীর মত। কথা বললে সাড়া দেয় না। যেন সারা দুনিয়াটাকে সে গ্রাহ্যই করে না।

: গোপনে খোঁজ নিলেন। যা জানলেন তাতে প্রহ্লাদ যে অপরাধজীবী, এ সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হলেন। একদিন এলেন ঘর তল্লাস করতে।

ঘর তল্লাস করতে গিয়ে এই কাণ্ড। চড় খেকে অব্যাহতি পেয়েও তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিছু না পেয়েও প্রহ্লাদকে বেঁধে এনে থানায় বসিয়ে প্রথমেই বললেন, এই বদমাস! আগে হলে সম্বন্ধ পাতিয়ে কথা বলতেন। এখন আর গালিগালাজ দেন না। নেহাত অসহ্য হলে বলেন—শুয়োরের বাচ্চা! মুসলমানকে বলেন—শয়তানের বাচ্চা!

—বন্দী বাঘ যেমন উদ্যত অস্ত্রের ভয়ে খাঁচার কোণে বসে অস্ত্রধারীর দিকে তাকিয়ে থাকে তেমনভাবে প্রহ্লাদ মুখ তুলে শুধু তাকালে।

—শুনছিস ?

—কি। প্রহ্লাদ শুধু বললে, কি।

—ঘনশ্যাম কোথায় ?

—কে ? প্রহ্লাদ যেন কঠিন রূঢ় হয়ে উঠল।

—ঘনশ্যাম দাস। নতুন বদমাসটা।

ক্রোধে প্রহ্লাদ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

—ঘনশ্যাম! ঘনশ্যাম! তারপর চীৎকার করে উঠল, জানি না। আবার চীৎকার করে উঠল, না, জানি না। আমি ডাকাতি করি না যে, তার খবর জানব।

—করিস না ডাকাতি?

—না।

—কি কাজ করিস?

—কাজ আমি করি না।

—তবে? খাস কি করে তুই?

—মা-কালী জোটান, খাই।

—মা-কালী? মারব শুয়ারকে এক থাপ্পড়।

—মার। বারণ করছে কে? মার।

বলতে বলতে প্রহ্লাদ অকস্মাৎ যেন ক্ষেপে গেল। সে বলতে লাগল, মার, মার, আমাকে তুমি মেরে ফেল। খুন করে ফেল, গুলি করে দাও, ফাঁসি দাও। মার আমাকে। মার। আমার মা-কালী, মা-কালীকে—

হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।—মা-কালী, মা-কালী, আমার মা-কালী!

দুঁদে দারোগা শিবরতন অনেক পাপী সোজা করেছেন, তিনি উঠেই এবার ঠাস করে এক চড় না কষিয়ে আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। প্রচণ্ড চড়।

প্রহ্লাদ বর্বর মানুষের মত 'আ—' বলে একটা ক্রুদ্ধ জান্তব চীৎকার করে উঠল, আ—আ—আ—!

তারপর উপুড় হয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল—মা-কালী! মা-কালী—মা-কালী! আ—! মা-কালী! আ! আ—!

শিবরতন এবার দমে গেলেন
পুরে দিলেন হাজতে।

প্রহ্লাদ ভল্লা।

বাপ ছিল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল। দীর্ঘজীবী অক্ষয় ভল্লারও অনেক কীর্তি। তবে সে ছিল দাঙ্গাবাজ। প্রহ্লাদ তরুণ বয়স থেকেই ডাকাতি ধরেছে। এত বড় লাঠিয়াল নাকি এ অঞ্চলে নেই। এমন কোন পাপ নেই যা সে করেনি। প্রথম বার-তিনেক সে ধরা পড়েছে, মেয়াদ খেটেছে, কিন্তু তারপর আর পুলিসের সাধ্য হয় নি তাকে স্পর্শ করতে।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে এই গ্রামে এই থানার সামনে ওই রাস্তাটার ওপারে এক দোকানদার খুন হয়েছিল। ওই ঘরখানা। ওরই বারান্দায় তার গলাটা কেটে ঘরের দরজার তালা ভেঙে যথা-সর্বস্ব নিয়ে গিয়েছিল। লোকটি ছিল ধনী, নিজের ধনের পরিমাণের চেয়েও পরের ধন তার ঘরে সঞ্চিত ছিল বেশি। বন্ধকী কারবার করত। থানার সামনে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমত। সে হল খুন। প্রহ্লাদকে সন্দেহ হল, লোকে বললে—সে না থাকলে এ কাজ হয় না। দারোগা তাকে ডাকলেন। প্রহ্লাদ এক কথায় বললে, হ্যাঁ, আপনি যখন বলছেন, তখন 'না' বলব কি করে? হ্যাঁ, এ কাজে ছিলাম আমি। আপনি ছিলেন—আমি ছিলাম। আমি পা ধরলাম, একজন হাত ধরলে, আপনি ছুরি চালালেন। আপনি নিজেই যখন বলছেন, তখন আমি 'না' বলব কি করে? সে দারোগা ধমক দিতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রহ্লাদ বলেছিল, আমি গাঁয়ের লোক, কিন্তু অনেক দূরে থাকি। তবে আমি না থাকলেই বা হয় কি করে? ঠিক কথা।

কিন্তু এই থানা—পঁচিশ হাত দূরে ঠিক ছামনে যখন এ কাণ্ড হল, তখন আপনি না থাকলেই বা হয় কি করে বলুন ?

কেসটার কিনারাই হয় নি ! তবে প্রহ্লাদ হাসত। বলত, কে জানে মশায় !

পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে।

কাদপুর ডাকাতির ইতিহাস আছে থানার খাতায়।

"কাদপুরের ছকু সাহা সম্পন্ন লোক। তাহার বাড়িতে উনিশ শো পনের সালে আগস্ট মাসে রাত্রি প্রায় একটার সময় ডকাতি হইয়াছে। মশাল জ্বালাইয়া, 'আ—বা—বা' হাঁক মারিয়া, ঘাটি পাতিয়া ডাকাতি। ঢেঁকির সাহায্যে দরজা ভাঙিয়াছে। ঢেঁকিটি উক্ত গ্রামেরই রামহৃদয় ঘোষের চালা হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল। ফেলিয়া গিয়াছে। দলে লোক ছিল পঁচিশ হইতে ত্রিশ জন। গৃহস্বামী ছকু সাহা প্রথম সূত্রপাতেই ঘরের জানালা ভাঙিয়া পিছনের দিকে লাফাইয়া পড়িয়া পালাইয়াছিল। সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া লোকদের ডাকিয়া তোলে। লোকজন জাগিয়াও কোন ফল হয় নাই। ঘাটির কাছে কেহ অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই। ঘাঁটি-আগলদারেরা চীৎকার করিয়া এবং লাঠি ঘুরাইয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। দুই-তিনজন পাকা খেলোয়াড় ছিল। মুখে ফেটা বাঁধিয়া কালি মাখিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। তবে একজনকে অধিকাংশ লোকেই চিনিয়াছে। সে প্রহ্লাদ ভল্লা। গ্রামের গোয়ালারা তাহাদের মহিষগুলি ডাকাতদের দিকে আগাইয়া দিয়াছিল, তাহারা চকিয়া উঠিয়া ডাকাতদের ঘাঁটির দিকে শিঙ বাঁকাইয়া খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছিল ; কিন্তু একজন লাঠিয়াল অকুতোভয়ে মোহড়া লইয়া লাঠি মারিয়া মহিষগুলিকে হটাইয়া দিয়াছে। তিনটি মহিষের একটি করিয়া শিঙ ভাঙিয়া

গিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এই লোকই প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ ছাড়া ইহা কেহ পারে না।

বাড়ির মধ্যে প্রায় দশ বারো জন প্রবেশ করে। মেয়েদের এবং পুরুষদের জ্বলন্ত মশাল দিয়া প্রহার করিয়া উৎপীড়ন করিয়া টাকার সন্ধান চায়, বাহির করিয়া দিতে বলে। ইহার মধ্যে শেখপাড়ার ভুরু শেখকে সকলে চিনিয়াছে। ভুরু ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে পর পর তিন দিন ছাগল কেনার অছিলায় এই বাড়িতে আসিয়াছিল এবং অনাবশ্যক সময়ক্ষেপ করিয়া বসিয়া ছিল। বাড়ির পিছন দিয়া চলিয়া যাইতেও দেখিয়াছে সকলে।"

তার পরের পাতায় আছে—

"ভুরু শেখকে গ্রেপ্তার করা হইল। ভুরুর শরীরে, হাতে, বুকে চারটি সদ্য পোড়া দাগ পাওয়া গেল। তাহার কিছু দাড়িও পুড়িয়াছে। মশাল লইয়া মারপিটের সময় অসাবধানতাবশত ইহা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রহ্লাদ ভল্লাকে পাওয়া গেল না। তাহার বাড়িতে বলিতেছে, সে গত পরশু অর্থাৎ ঘটনার পূর্বদিন হইতেই সদর-শহরে গিয়াছে; সেখানে উকিল রঘুনাথবাবুর বাড়িতে পুত্রের বিবাহে রায়বেঁশে নাচের বায়না লইয়াছে।"

সত্যই তাই। রঘুনাথবাবু সদরের ফৌজদারি আদালতের বড় উকিল। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে জজ সাহেবের দায়রা পর্যন্ত প্রত্যহ তিন-চারটে মামলা তাঁর থাকেই। দায়রাতে আট টাকা ফী। নিজের ছেলের বিবাহে তিনি শখ করে রায়বেঁশে নাচ করিয়েছিলেন। এক দল নয়, তিন দল। বলেছিলেন, ওদের অনেক টাকা খাই। আর ছেলের বিয়েতে ওদের বায়না না করলে চলবে কেন? এবং এই

ঘটনার দিন রাত্রে বড় মজলিসে জজ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিস সাহেব এস.-ডি. ও. থেকে উকিল মোক্তার জমিদার মহাজন ব্যবসাদারদের সম্মিলিত করে যে আপ্যায়নে আপ্যায়িত করেছিলেন, তার মধ্যে হ্যাপি-ভ্যালির চা থেকে জনি ওয়াকার পর্যন্ত পানীয়ের সঙ্গে এই রায়বংশে দলের দুর্দান্তদের লাঠিখেলার আসর ছিল। তারপর ছিল খ্যামটা নাচের আসর। কিন্তু খেলার আসর এমনই জমে উঠেছিল যে, নাচের আসর এগারোটার আগে বসতে পারে নি। পুলিস সাহেব ছিল খাস লালমুখ —প্রাইস সাহেব ; যেমন ছিল দুঁদে, তেমনই ছিল খেলা আর শিকারে ঝোঁকালো। যে দারোগা গোঁফ না রাখত, তাকে ডেকে বলত, তুম ঔরৎ হ্যায় ? মেয়েলোগ আছে ? মস্টেচ কিধার গিয়া ? যে দারোগার গোঁফ ঝুলে থাকত, তার গোঁফের দু দিক নিজের হাতে ধরে উপরের দিকে টেনে তুলে দিয়ে বলত, এইসা পাকাও।

সেই প্রাইস সাহেব খেলা দেখে মেতে উঠেছিল। বলেছিল, রঘুনাথবাবু, ই-লোগকে ডর করতে মানা করেন। আই অ্যাম এ স্পোর্টসম্যান, খেলা দেখে আমি ডেকয়িট ভাবিব না।

তারপর বলেছিলেন, সট্যি খেলা ডেখলাও বাবা-লোক। নকল ডেখিব না। হ্যাঁ। ঠুক-ঠাক না—একডম ঠুঁই-ঠাঁই। লাগাও। এই ডশ রূপেয়ার নোট। বকশিশ। টেবিলে নোটখানা রেখে জনি-ওয়াকারপূর্ণ গেলাসটা ঠক করে চাপা দিয়ে আবার বলেছিলেন, লাগাও। এবং গেলাসটা তুলে চুমুক দিয়েছিলেন। সাত জন লোক সারি দিয়ে দাঁড়াল লাঠি হাতে। ওদিক থেকে প্রহ্লাদ হাঁক মেরে পড়ল লাফ দিয়ে। পাম্প লাইট জলছিল, সেই আলোতে মিনিট চারেকের জন্য দেখা গেল, প্রহ্লাদ এদিক থেকে ওদিক বিদ্যুৎবেগে ঘুরে এল বার তিনেক। সাতখানা লাঠির উপর তার লাঠির ঘা পড়ছে।

লাঠি ঠিক দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে একটি ক্ষীণ ঝকমকে রেখার নড়াচড়া। তেল-মাখানো ঘুরন্ত পাকা লাঠির চিক্‌চিকে গায়ে আলোর ছটা বাজছে। সেই ছটাটা ঘুরছে। আর শব্দ উঠছে, হুঁই-হাঁই। তারপরই দেখা গেল, একজন টলল, প্রহ্লাদ চলে গেল ওপারে।' এবার সব কজন তাকে চক্রাকারে ঘিরে ফেললে। সব কখানা লাঠি একসঙ্গে পড়তে লাগল। খটখট খটখট শব্দ। তারপরই দু-তিন জন পড়ল। প্রহ্লাদ হাঁক মেরে বেরিয়ে এল, সাহেবকে সেলাম করে দাঁড়াল। প্রহ্লাদের বাহুতে পিঠে লাঠির সোঁটা সোঁটা দাগ, ফেটে রক্ত পড়ছে। ওদিকে তিন জন মাটিতে মাথা ধরে বসে আছে, মাথা ফেটেছে, কালো তেল চকচকে চুল বেয়ে গড়িয়ে আসছে গাঢ় লাল রক্তের ধারা। দু-জনের মাথা সেলাই করতে হল। প্রহ্লাদ দশ টাকার নোট নিয়ে পুলিস সাহেবের নামে আবা-আবা ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে এল। তখন রাত্রি নটা। এখানেই শেষ নয়, পরদিন ভোর ছটায় সে আবার ওই শহরেই পাঁচ আইনে কনস্টেবলের হাতে ধরা পড়ল। কনস্টেবলটা বলে, লোকটা তাকে গ্রাহ্যই করলে না। ধরা পড়তে অবশ্য প্রহ্লাদ কোন অবাধ্যতা দেখায়নি, বিনীতভাবেই সঙ্গে গিয়েছিল, বলেছিল, এতশত তো জানি না। ভুল হয়ে গিয়েছে।

প্রহ্লাদকে ডাকাতির অপরাধে চালান দিয়ে দারোগা অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। স্বয়ং প্রাইস সাহেব বলেছিলেন, এ হয় না, হতে পারে না। নটা পর্যন্ত লোকটা খেলা দেখিয়েছে। আমার চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। আবার ছটার সময় ধরা পড়েছে এখানেই—মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে। নাইন আওয়ার্স। এর মধ্যে থার্টি মাইলস্ পথ হেঁটেছে, ডাকাতি করেছে, এটা ফিজিক্যালি

ইম্পসিব্‌ল্‌। তবু চালান গিয়েছিল প্রহ্লাদ। কিন্তু এস.ডি.ও.-কোর্টেই পুলিশ তার নামের চার্জশীট তুলে নিয়েছিল মানে-মানে। লোকটা সাক্ষাৎ শয়তান, তাতে শিবরতনের সন্দেহ রইল না। পুলিস সাহেব হলে কি হবে, ইংরেজ প্রাইস সাহেব এ দেশের এই শয়তানদের জানে না।

শিবরতন উনিশ শো পনের-ষোল সাল পর্যন্ত ইয়ং-বেঙ্গল ছিলেন। সেকালে বুড়িবালামের যুদ্ধের কথা মনে তাঁর রঙ ধরিয়েছিল। সংকল্প করেছিলেন, বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে হয় এমনই কোন যুদ্ধে প্রাণ দেবেন, কিন্তু এমনই কর্মফের যে, শেষ পর্যন্ত তিনি হলেন পুলিস দারোগা। একবার ক্যালকাটা পুলিসে যাবার চেষ্টায় ইণ্টারভিউয় গিয়ে সার্‌ চার্লসের সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশন হয়ে স্যালিউটও দিয়েছিলেন। তা হোক, শিবরতন ঘুষ নেননি, দুষ্টকে দমন করে এসেছেন, উদ্ধত ভদ্রজনকে ঠাণ্ডা করেছেন, তাদের তোমরা সাধু বল—বল গিয়ে, গ্রাহ্য করে না শিবরতন। ও কালী দুর্গা শিব কেষ্ট—এ সবের ভাঁওতা দিয়ে শিবরতনের চোখে ধূলো দেওয়া চলবে না। এ দেশকে শিবরতন জানে, মানুষগুলিকেও জানে। প্রহ্লাদকে সে সহজে ছাড়বে না। লোকটা দশটা কি বারোটা বিয়ে করেছে। চার বছর পাঁচ বছর অন্তর পুরনো স্ত্রীকে খেদিয়ে দিয়ে নতুন স্ত্রী ঘরে এনেছে। লোকটার কটা ছেলে, কে জানে! তবে বেঁচে আছে মাত্র দু-তিনটে। বাকিগুলো, নেড়ী কুকুরের ছানারা যেমনভাবে মরে—তেমনিভাবেই মরেছে। যে তিনটি বেঁচে আছে, তারা এ এলাকা ছেড়ে গিয়ে বাস করছে। ঘনশ্যাম! ঘনশ্যামও সেই শক্তি রাখে। প্রহ্লাদের কাছে ঘনশ্যামের নাম করতে প্রহ্লাদ চীৎকার করে ওঠে, আ—! অর্থাৎ ঘনশ্যামের সঙ্গে হবে বোঝাপড়া তার! কথার মধ্যে থেকে এ সত্যটুকু

আবিষ্কার করতে কষ্ট হল না দারোগার, বুড়ো বাঘ আর তাজা বাঘে বিবাদ আছে। বুড়োটা প্রচণ্ড শয়তান।

এ শয়তানকে শিবরতন দেখবেন। এ. এস. আই-কে ডেকে বললেন, দাও, ব্যাটাকে এখন ছেড়ে দাও। পরে দেখব শয়তান কখনও সাধু হয় না।

* * *

শয়তানই বা কি, সাধুই বা কী? ও সব প্রহ্লাদ বোঝে না। কোন কথাই তো সে অস্বীকার করে না। ছকু সাহার বাড়িতে ডাকাতি? হ্যাঁ, সে করেছে। সদর-শহর থেকে রাত্রি নটায় বেরিয়ে পনের মাইল রাস্তা চলে এসেছে চিতাবাঘের মত। লাঠিতে ভর দিয়েছে, লাফ মেরেছে। দুপহরের শেয়াল যখন ডাকল, তখনও এক ক্রোশ পথ বাকি। ষড়যন্ত্র আগে থেকেই পাকা ছিল, সে ভেবেছিল, ঠিক সন্ধ্যের সময় বগলে রসুন টিপে জর হয়েছে বলে শোবে, তারপর একটা কিছু চাদর চাপা দিয়ে শুইয়ে রেখে বেরিয়ে পড়বে। শীতের দিন সন্ধ্যে হয় পাঁচটায়, সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ নাচগান আরম্ভ হবে, তখন কে কার খোঁজ রাখে? গোকুলে কে কার মেসো? সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে দুলকী চালে সাত ক্রোশ পথ কতক্ষণ? দুপহরের শেয়ালডাকার আগেই এসে পৌছুবে। ঠাঁই নির্দিষ্ট ছিল—কাদপুরের উত্তর-পশ্চিম মাঠে বরমপালির জোলে। ছেলেপোতার বাঁধ। কিন্তু এমন একটা আসরে খেলা দেখবার লোভ সামলাতে পারে নি সে! আটটায় খেলা ভাঙবে। সাড়ে আটটায় বেরুলে একটু ত্বরিত চালে চলতে হবে। কিন্তু বেজে গেল নটা। দশ টাকার নোটটা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে সাহেবের নামে আবা-আবা দিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল। যখন এসে পৌছেছিল, তখন দুপহর গড়িয়ে গিয়েছে। দল

তখন উঠেছে, সে আর আসবে না, যা করবার তারাই করবে। এমন সময় সে হাজির হয়েছিল। মোষগুলোর শিঙ সে-ই ভেঙেছিল। ছেলেপোঁতার বাঁধে—তাজা চোলাই মদ তখন তার শরীরে নতুন তাগদ এনে দিয়েছে। মাথায় সদর-শহরের খেলার উল্লাসের উপর ডাকাতির নেশা! যমের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস জেগেছে। যমের বাহনের শিঙ ভেঙে সে যে কি উল্লাস!

আ—আবা—আবা—আবা!

বলতে বলতে প্রহ্লাদের ধ্বনি দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সে কি পারে? প্রহ্লাদ ধ্বনির বদলে হা-হা করে হাসে। বলে, মাঘ মাসের রসালো মূলোর মত মুচড়ে গেল। জয় মা-কালী! ফেরার পথে কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পথে কষ্টের আসান করলেন মা-কালী। জয় মা-কালী! ক্রোশ তিনেক পর কুচুইঘাটায় পশ্চিমে তামাক-ব্যবসায়ী সাহুদের তামাক-বওয়া ঘোড়াটা পড়েছিল নজরে। শীতের দিন, চালায় বাঁধা ঘোড়াটা বোধ হয় শীতের চোটেই চিঁহিঁ শব্দে ডেকে প্রহ্লাদকে আকর্ষণ করেছিল। না, শীত নয়, মশা নয়, মাছি নয়,—মা কালী। বাস্। মা কালীর ইচ্ছেতেই ঘোড়াটা ডেকে উঠেছিল।

প্রহ্লাদ বলে, আর কি? ঢুকলাম চালায়; দড়ির লাগাম এঁটে ব্যাটাকে বের করে চাপলাম পিঠে। খেজুরের ডাল ভেঙে নিয়ে কষে দিলাম ঘা কতক। ছুটল পক্ষীরাজ। ঘোড়াটা বেশ বড়সড়। কিন্তু বুড়ো আর হাড়-পাঁজরা সার। আপসোস হল কম্বলের পালানের জন্যে! ব্যাটা যত ছোটে, তত শিরদাঁড়ার ওপর ঠুকে ঠুকে পড়ি। কিন্তু কি করব? পক্ষীরাজ চড়ে আরও সাড়ে তিন কোশ এসে আধ কোশ থাকতে ব্যাটাকে ছেড়ে দিলাম। লাগামটা খুলে ফেলে দিলাম। ব্যাটাকে নামিয়ে দিলাম দলদামওয়ালা একটা পুকুরে।

তারপর আধ কোশ রাস্তা ধীরে সুস্থে হেঁটে শহরে ঢুকে কনস্টেবল ব্যাটাকে দেখে ওই মতলব মনে হল। ধরুক ব্যাটা আমাকে। হাজতে নিয়ে চলুক। বসে গেলাম রাস্তার ধারে। লাগুক পাঁচ আইন।

কিন্তু থানার সামনে ওই খুনে আমি ছিলাম না। ওই চুরির মত চুপি চুপি একটা মানুষের গলা কেটে সর্বস্ব লুঠে নেওয়ার নাম ডাকাতি না কি! ধাটি নাই, খেলা নাই, হাঁক নাই—থু—থু—থু। ও হল ওই থানার জমাদার দারোগা আর এক—মুর্শিদাবাদের দরজী, তাদের কাজ আরও ছিল। এখানকার কজন, সবসুদ্ধ জনা দশেক। তার বেশি নয়। দারোগা হল মূল। থানার ডাইরিতে আছে, দারোগা রাত্রে দাগী দেখতে রোঁদে বেরিয়েছে। তা বেরিয়েছিল। আমীর হোসেন দারোগার ছিল এক তেজী ঘোড়া, নীলচে রঙ—সেই ঘোড়াতে চড়ে সে ঘাটতোড়ে পুণ্যায় দাগী দেখে ফিরে কাজ সেরে ফের চলে গিয়েছিল—ধনডাঙা সুদপুর ভ্রমরকোল পর্যন্ত। তবে যদি বল, ও কথায় হাস কেন? জানি বলেই হাসি। তাতেই দারোগাকে বলেছিলাম, আমি ধরেছিলাম বণিককে, তুমিই তো গলায় ছুরি দিয়েছিলে বাপু।

অনেক ডাকাতি করেছি! কত বলব! তুমি পাপ বল? আমি বলি না।

আর বারোটা পরিবারের কথা? মিছে কথা! বারোটা নয় দশটাও নয়, সাতটা। সাতটা বটে। তাও সাতটা পরিবার নয়। পরিবার তিনটে। বাদবাকি চারটের সঙ্গে চোখের নেশার খেল; যতদিন খেলতে ভাল লেগেছে খেলেছি।

প্রথমটা বিয়ে-করা পরিবার। বাবা বিয়ে দিয়েছিল, আমার বয়স দশ, তার বয়স তিন।

আমি যখন মরদ হলাম, সতের-আঠার বছর বয়স, তখন তার বয়স দশ। হঠাৎ ভাল লাগল হীরেপুরের ভিনজাতের মেয়ে বাসিনীকে। আমারই সমান বয়স। বাসিনী তখন খারাপ হয়েছে, রোজ বাবুদের লোক এসে বাসিনীকে নিয়ে যায়, আবার সকালবেলায় রেখে যায়। বাসিনীকে ভালবাসলাম। তাকে নিয়ে এলাম ঘর।

কী করে আনলাম? আনলাম লাঠি খেলে। হীরেপুরের ছোকরাদের আখড়ায় লাঠি খেলে সবাইকে হারিয়ে বাসিনীর মন পেলাম। তারপর একদিন পথে ওৎ পেতে থাকলাম, বাবুদের লোকের গালে মারলাম চড়। বাসিনীকে বললাম, চল্ আমার ঘর। সঙ্গে ছুরি ছিল, বললাম, না যদি যাস তবে তোর গলা কাটব। কেটে, নিজের গলা। এ পুরীতে যদি মানে মানে না যাস তো যমপুরীতেই চল্। একসঙ্গে তো থাকা হবে।

বাসিনীর বাবা ছিল না, মা ছিল, সে খানিকটা হাউমাউ করেছিল, তা বাসিনী নিজেই বললে—ঘরে ফিরে আমি যাব না। ওই কাজ আর করব না। আমি পেহ্লাদের সঙ্গেই যাব।

বুঝেছ তো? করতে চাইবে কেন? পয়সাতে ভালবাসাতে তফাত অনেক গো! বুঝেছ? সে আমার ঘরের গিন্নী হবে, ভালবাসার লোক পেয়েছে, ওই কাজ আর করতে চাইবে কেন?

বাবুরা? আরে, কালী কালী বল। ওদের মতন ভীতু ভেড়া আছে নাকি! রাতের বেলায় যাকে সমাদর করে, দিনের বেলায় তাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরে বাবা, মেয়েটা যদি হেসে ফেলে, কি কথা বলে! পাপ ওইখানে। বুঝেছ?

বাসিনীকে ভালবেসেছিলাম, তাই তাকে মাথায় করে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। পাঁচ বছর ছিল সে। সে আমার সুখের কাল। পাঁচ

বছরের শেষ বছরে আমার জেল হল দু বছর—সেই প্রথম জেল। এই আমার বিয়োলো পরিবার বাড়ি এসে উঠল। বাসিনী তাকে বললে, তোমার স্বামী তুমি নিয়ে থাক ভাই, আমি চললাম।

বাবা বারণ করেছিল, আমার বউ শক্তি বারণ করেছিল, বলেছিল—না, তুমি যাবে কেন? দুটো বিয়ে কি করে না?

—করে। তা আমি থাকলে ও-স্বামীকে পাবে না। আর আমি সতীন সইতে পারব না। আমি চললাম। সে ফিরে এসে আমাকে ছাড়বে না।

চলে গেল ঝুমুরের দলে। গাইতে পারত বাসিনী—গলা ছিল ভাল, রূপ ছিল, ঝুমুরের দলে নাম করেছিল বাসিনী।

তারপর শক্তি, আমার বিয়োলো পরিবার, সে ছিল ভারি ঠাণ্ডা। মাটি বলে, শক্তির চেয়ে আমার তাত আছে। সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ। শুধু কাঁদতে জানত, আর এক কথাতেই বোকার মত হাসতে পারত। আমার অঙ্গ জ্বলে যেত।

কি করব! ফের একজনকে নিয়ে এলাম।

সদ্‌জাতের কন্থে, ঘর থেকে বেরিয়ে চলেছে রাত্রে, গঙ্গার তীরে যাবে, ডুবে মরবে। বিধবা মেয়ে, কিন্তু মতিভ্রম হয়েছে; না মরে উপায় নাই; নইলে কোলে সন্তান আসবে।

আসুক। কি হয়েছে তাতে? বললাম, চল আমার ঘর। তোমার সন্তান আমার হবে। 'না' বললে পেহ্লাদ শোনে না। সে নিয়ে যাবেই তোমাকে। কিছুতেই ছাড়বে না। যাকে আমার বড় ছেলে বল, সে ওই ছেলে।

তারপর গাঁয়ে কলেরা হল, এরা দুটোই গেল। দশ বছর ঘর করেছিলাম। এও খুব সুখের কাল। তারপর সাঙা করলাম সরোজিনীকে।

আমার জেল হল, সরোজিনী পালাল। দুটো ছেলে হয়েছিল। সে দুটোকে হারামজাদা রেখে গিয়েছিল। আমি কি করব? বাউণ্ডুলের মত ঘুরতে ঘুরতে ছেলে দুটো মরে গেল।

তার পরের তিনটের কথা বলব না। এনেছি, থেকেছে। কেউ নিজে পালিয়েছে। কাউকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। 'দিয়েছি, বেশ করেছি। কোকিল বলে পুষে যদি দেখি কাক হল, তবে পুষেছি বলে তাকে খাঁচায় রেখে কা-কা শব্দ শুনতে হবে নাকি?

কি করে খাবে?

সে আমি কি করে বলব? আমি কি করে খাব, কেউ ভাবে নাকি? ভাবলেও কিছু হয় নাকি? মালিক মা-কালী।

দুঃখ? তা কুকুর বেড়াল পুষলে দুঃখ হয় তো। যে মানুষটার সঙ্গে ঘর করলাম দশ বিশ দিন, তার জন্যে দুঃখ হয় বইকি। তাড়িয়ে দিতেও দুঃখ হয়। পালিয়ে গেলে দুঃখও হয়, রাগও হয়। মন খানিকটা খ্যাচ-খ্যাচ করে। তবে তোমাদের মত চোখের জল ফেলা দুঃখ, সে প্রহ্লাদের হয় না! রোগে কি চোট লেগে একেবারে কাতর হলে কেঁদেছি। নইলে প্রহ্লাদ কখনও কাঁদে নি। আমার বিয়োলো পরিবার শক্তির সন্তান-টন্তান হয় নি। ওই সদ্‌জাতের মেয়ে যামিনী ওরই ছেলে চারটি। তার মাঝেরটি আমার ভারি ন্যাওটা ছিল। তা সেও মরেছিল কলেরায়, ওই মায়েদের সঙ্গে। তা কি করব? হয়েছিল, গিয়েছে। কালীর খেল। কেঁদে কি করব? কান্না আমার আসে না।

* * *

সেই প্রহ্লাদ আমি আজ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরছি!

আমার মা-কালী! মা-কালীকে তারা জুতো পরে ছুঁয়ে দিলে! বেদী থেকে নামিয়ে দিলে! চোখ মুছলে প্রহ্লাদ। নাঃ, আর সে

চীৎকার করে কাঁদবে না। দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে পড়ুক, বার বার প্রহ্লাদ আক্ষেপসহকারে মাথা নেড়ে মনে মনে ওই কথাই বললে—মা-কালী, তার মা-কালীকে ছুঁয়ে দিলে?

তোমাদের কালী মা-কালী, দেবতা; আর তার কালী মা-কালী নয়? তাকে জুতো পরে ছুঁয়ে দিলে?

—কি হল প্রহ্লাদ?

জিজ্ঞাসা করলেন বাজারে দত্তমশায়।

প্রহ্লাদ উত্তর দিলে না। কি হবে উত্তর দিয়ে? দত্ত বললেন, আমি সব শুনেছি প্রহ্লাদ, তুই একটা দরখাস্ত কর্। মামলা করতে পারলে আরও ভাল হবে। নির্ঘাত চাকরি যাবে, বুঝেছিস্?

না।—প্রহ্লাদ চলে গেল ঘরের দিকে।

বাড়িতে গিয়ে সে কালীর সামনে বসল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কালী-মূর্তির দিকে। নাঃ! মা আর হাসছে না। অপবিত্র হয়ে মা চলে গিয়েছে।

সে চলে গেল মাঠের দিকে। একটা নির্জন স্থানে একটা ইঁটের পাঁজা। সাপের উপদ্রবের জন্য বিখ্যাত। প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে এখানে ইঁটের ভাটা করেছিল রেল-কোম্পানি! চারিদিকে প্রচুর ইঁট ছড়ানো; এই ইঁটের ফাঁকে এসে বাসা বেঁধেছে রাজ্যের সাপ। কিন্তু প্রহ্লাদ সাপকে ভয় করে না। সাপ সে ধরতে পারে। তবে ও-ব্যবসা সে করে না। এই ইঁটের স্তূপের মধ্যেই তার গোপন ব্যবসার কর্মকেন্দ্র। এখানে থাকে চোলাই মদ। এখন ওই তার পেশা। ইঁটের ভিতর থেকে একটা বোতল বের করে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মা-কালীকে নিবেদন করে খানিকটা গলগল করে খেয়ে

নিলে। আর একটা বোতল বের করে নিয়ে ফিরল। আকণ্ঠ মদ্যপান করে ভাম হয়ে বসে রইল দাওয়ার উপর!

কিছুক্ষণ পর উঠে গিয়ে কালীর সামনে বসে বললে, তু মরে যা, তু মরে যা, তু মরে যা।

বিচিত্র প্রহ্লাদ। বিচিত্র তার পূজাপদ্ধতি এবং শাস্ত্র।

সন্ধ্যাবেলায় সে ঢাকী ডেকে নিয়ে এল।

বাজাও ঢাক। কালী-মা চামড়া ছোঁয়া পড়েছে, মা চান করতে যাবে।

মাটির কালী স্নান করবে। সে-ই নিয়ে যাবে মাথায় করে পুকুরের ঘাটে। রঙ ধুয়ে যাবে, সে তা জানে। খানিকটা হয়তে গলেও যাবে। যাক। কাল রোদে শুকিয়ে তাতে মাটি লাগিয়ে রঙ দিয়ে আবার তাকে নতুন করে বেদীর উপর স্থাপন করবে। বেদীটা মেরামত করতে হবে। পোষা সাপটা অনাথের মত বেড়াচ্ছে।

মধ্যে মধ্যে রাগ হচ্ছে তার। যেমন মা-কালী, তেমনই কি হয়েছে গোখরোটা। ও-বেটীর পিঠে বুকে লাঠি দিয়ে ঠুকলে, জুতা পায়ে দিয়ে ছুঁলে—কিছু হল না ব্যাটা দারোগার! মুখ থুবড়ে পড়ল না, মুখ দিয়ে রক্ত উঠল না, অজ্ঞান হল না, কিছু না! আর সাপটা জাত-গোখরো—সেও মাথা তুললে না! বিষ নাই, দাঁত নাই, ফণা তো আছে।

আবার মনে হয়—তুই? তুই কি করলি? তুই প্রহ্লাদ ভল্লা, তোর লাঠির জোরে মোষের শিঙ ভেঙেছে, তোর হুঙ্কারে আবা-আবা হাঁকে রাত্রের অন্ধকার কেঁপেছে, মানুষ তো মানুষ—ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। সেই তুই? তুই কি

করলি ? তোর মুখের উপর বললে—মা-কালী মিছে ? তোর চোখের সামনে তোর মা-কালীকে ছুঁলে ?

কালী মাথায় নিয়েই সে বার কয়েক মাথা ঝাঁকি দিতে চেষ্টা করলে। অর্থহীন ভাবেই যেন চেঁচিয়ে উঠল 'অ্যা—ই' বলে।

ঢাকীটা চমকে উঠল। কাকে বলছে তাল তো কাটে নাই বাজনার! তবে? সে মুখের তাকালে!

সত্তর বছর বয়সেও দাঁত অনেকগুলিই আছে প্রহ্লাদের। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বললে, যা,

গাল দিলে সে নিজেকেই।

ঢাকীটা বললে, কি বলছ গো ভল্লা-খুড়ো ?

প্রহ্লাদ বললে, তোকে নয়। বাজা, তু জোরে জোরে বাজা।

নামল সে পুকুরঘাটে।

নে, চান কর্ অবেলায়। দে, ডুব দে। দে। হাত নাড়লি না, পা নাড়লি না, তেমনি চোব্, জলে চোব্!

মূর্তিটাকে সে জলে ডুবিয়ে ধরলে। যেন জীবন্ত কোন মানুষকেই ধরেছে।

ওঠ্। নে, ওঠ্।

রঙ প্রায় সবটাই মুছেছে। কয়েকটা আঙুল খসেছে। জিভটা গেছে। শিবেরও তাই। ভুঁড়ির খড়ের তালটা বেরিয়ে পড়েছে। হাতের পায়ের আঙুল গিয়েছে, ডম্বরুটার ছাল ছেড়েছে, কানের ধুতরো ফুলগুলো গিয়েছে, নাকের ডগাটাও খানিকটা খসেছে। সাপের মাথাগুলো সব খসেছে।

মূর্তিটা ভিজে ভারী হয়েছে অনেক। হোক। সেও প্রহ্লাদ! হেঁচকা টানে তুলে মাথায় চাপিয়ে বাড়ি এনে রাখলে উঠানে। থাক্,

এইখানে থাক্। সে বসল, ঢাকীটাকে বললে, বস্। টেনে নিলে বোতলটা। নিজে খানিকটা খেয়ে ঢাকীকে বললে, হাঁ কর্।

তার মুখে খানিকটা ঢেলে দিলে। তারপর বললে, কাল সন্ধ্যেতে কালীর পূজা হবে, বুঝলি? ঢাক কাঁসি শিঙে চাই। ঠিক সন্ধ্যের সময় আসবি। আর ভোরবেলায় ধুমুল দিয়ে যাবি।

ঢাকীটা চলে গেল। সে আসবে। পয়সা প্রহ্লাদ দেবে। বাকির কারবার সে করে না। তবে কিছু কম দেয়। তা দিক। তেমনই ওই চোলাই মদ দেবে পেট ভরে, প্রসাদ খাওয়াবে ভাল করে। আজকের বাঘির দক্ষিণে নেই। ওই মদে মদেই শোধ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রহ্লাদ চুপ করে বসে রইল অন্ধকারের দিকে চেয়ে। দেহের নির্যাতন সে কোনদিনই গ্রাহ্য করে নি। আজও তার সে কথা মনে নেই। সে ভাবছে দারোগার কথাগুলি। সে ডাকাত! ডাকাত বলায় দুঃখ সে কোনকালেই অনুভব করে নি। ডাকাত, তার মত ডাকাত হয় কে? মরদ না হলে ডাকাত হয় না। বাঘের মত সাহস চাই, তেমনই হাঁক চাই, তেমনই চাই বুকে আর হাতে জোর। তবে ডাকাত হয়। তাকে তুই বারোটা বিয়ের কথা বলেছিস্, বারোটা নয়—সাতটা বিয়ে করেছে সে। তা হোক, ওতেও তার দুঃখ নেই। কিন্তু মা-কালীকে নিয়ে ভণ্ডামি করে, মা-কালী তার মিথ্যে, এ কেন বললি? কেন তার মা-কালীকে ছুঁয়ে দিলি? তুই পাপী, মহাপাপী। তোকে সাজা পেতে হবে। নিশ্চয় হবে।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে। ওই মাঠের ওপার থেকে এগিয়ে আসছে হাঁ করে—মাটি থেকে আকাশ জুড়ে অন্ধকার ফুলতে ফুলতে এগিয়ে আসছে। গাছপালা মিলিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে। আকাশে তারা ফুটছে। ওই পশ্চিম দিকের আকাশে, সূর্য যেখানে

পাটে বসে, তার খানিকটা ওপরে জলজল করছে সবচেয়ে বড় তারাটা। ও-ই আবার ভোরবেলায় দেখা দেবে পূব আকাশে, সূর্য যেখানে উদয় হবে—তার খানিকটা উপরে, ধকধক করে জ্বলবে। ভুলকো তারা। মাঝ রাতে মাঝ-আকাশে দেখা দেবে কালপুরুষ, তার সঙ্গে একটা তারা আছে ধকধক করে। কই, সাত ভাই কই? ওই—ওই সাত ভাই, উত্তর-আকাশের উপরে। ওই সবাইকে সে সাক্ষী মানছে। বলুক, সবাই বলুক। প্রহ্লাদের পাপ পুণ্য সবের সাক্ষী ওই ওরা। প্রহ্লাদের কালীপূজার সাক্ষী ওরা। বলুক, ওরা বলুক।

ডাকাতি তার কুলকর্ম। তার পিতামহ করেছে, তার পিতা করেছে, সে করে। ছেলেবেলায় কখন সে এ কথা জেনেছিল, বুঝেছিল, তা তার মনে নেই। হয়তো বা মায়ের গর্ভবাসে থাকতে জেনেছিল, বুঝেছিল। রাত্রে সে তার বাপকে দেখেছে লাঠি হাতে বেরিয়ে যেতে, আবার ফিরতে দেখেছে গভীর রাত্রে বা শেষ রাত্রে। বাপের কি মূর্তি সে! কোনদিন জিজ্ঞাসা করে জানতে হয় নি, বুঝতে হয় নি। গাছ যেমন চেয়ে হাত পেতে খায় না, মাটির তলায় শিকড় মেলে টেনে খায়, যত খায় তত নীচে শিকড় চালিয়ে আরও টানে, তার জানা বুঝা শিক্ষা তেমনই। যেমন ডাকাতিতে, তেমনই এই কালী-মাকে জানায়।

তার কালী-মা মিছে? তাঁকে তুই ছুঁয়ে দিলি? জুতো পরে? আচ্ছা। দেখাবে তোকে প্রহ্লাদ। কাল নূতন করে কালীমায়ের অঙ্গরাগ করে পূজো করে তারপর তোকে দেখাবে। কাল সমস্ত দিন কাজ, মা-কালীকে মেরামত করে, রোদে শুকিয়ে, না শুকোয় তো আগুন জেলে সেঁকে শুকিয়ে রঙ দিতে হবে। তারপর পূজো। কলাগাছ চাই, ঘট চাই, সিঁদুর চাই, ডাব চাই, মিষ্টি চাই, চাল চাই, ডাল চাই, পাঁঠা চাই, কাঠ চাই, নুন-তেল-মসলা-আদা-পেঁয়াজ, ফুল

বেলপাতা—ফর্দ তার মুখস্থ। পাঁঠা, একটা ভাল পাঁঠা চাই। ওই সাতনা হাড়ীর একটা শিঙ-ভাঙা বড় পাঁঠা আছে। তার মা-কালীর সে সব বাছা-বিছার নেই। শিঙ-ভাঙা, শেয়ালে-ধরা, খুঁতো—এ সব খুঁতখুঁতুনি নেই। বলি হলেই হল, তাজা রক্ত আর প্রচুর মাংস। পেঁয়াজও খায় তার মা-কালী।

লে মা, খা মা, দয়া কর্ মা। পাপ খণ্ডা মা। পার করিস মা। ব্যাস্। জয় কালী বোম কালী কালী কালী—এই মন্তর।

সাতনের ওই পাঁঠাটাই ঠিক হবে। পাঁঠাটা সদ্জাতের পূজোয় লাগবে না। তা ছাড়া সাতন আজকাল চাষ করলেও এককালে তারই দলের লোক ছিল, ডান হাত বাঁ হাতের একটা হাত ছিল, এখনও তাকে মান্য করে, তার পাঁঠাটা সে কম-সম করেই দেবে। তাজা পাঁঠা, চার আঙুল লম্বা শিঙ, অনেকটা রক্ত পড়বে। সাতনকেও প্রসাদ দেবে।

উঠল প্রহ্লাদ। হাত দুটোকে বার কয়েক ভেঁজে নিলে। বার কয়েক মুঠো ভাঁজলে। তারপর চলল।

আরে! দুর ব্যাটা বুড়ো হাবড়া ঢোঁড়া কোথাকার! চলতে গিয়ে সেই গোখরোটার গায়ে তার পা পড়েছে। সাপটা জড়িয়ে ধরেছে, কামড় মারছে। হুঁ, এখন তেজ খুব! তখন? তখন কি হয়েছিল? ব্যাটা হারামজাদা! নে, নে, কামড়া।

সাপটার উপর থেকে পায়ের চাপ আলগা করে সে পাক খুলে সেটাকে তুলে নিলে, গলায় চাদরের মত ফেলে নিয়ে চলল।

সাপটার বিষের থলি আর দাঁত একেবারে চেঁচে-ছুলে তুলে দিয়েছে প্রহ্লাদ। তার জীবনদর্শন অনুযায়ী সে প্রতিটি পরিবারকে খুব ঠেঙিয়েছে আর যতটি সাপ পুষেছে তার বিষের থলির চামড়া এবং দাঁত নিয়মিত চেঁচে-ছুলে দিয়েছে। সাপ পোষার উপর একটা

ঝোঁক আছে তার। সাপ পোষ মানে কি না পরীক্ষা করার জন্য নয়, ওটা তার শখ। প্রহ্লাদের যে মা-কালী, তার গলাতেও সে সাপের হার করে দিয়েছে তারামূর্তির মত।

বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে চালের নীচে দেওয়ালের খানিকটা মাটি আঙুলের টানেই টেনে খসিয়ে ফেললে। বের হল একটি গর্ত। দেওয়ালের ভিতর লম্বালম্বি দুটি জলের পাইপ বসানো আছে। তার ভিতরে হাত পুরে টেনে বার করলে লম্বা ঈষৎ-বাঁকা একটা কিছু।

একখানা তরোয়াল। সযত্নে ন্যাকড়া দিয়ে পরিপাটি করে জড়ানো। বাঁট পর্যন্ত ন্যাকড়া-ঢাকা।

বের করে সে ঘরের দাওয়ায় আলো জেলে বসল। ন্যাকড়ার ফালি খুলে ফেললে। ন্যাকড়ার ফালি—এক পুরু নয়, দু পুরু। তার নীচে বহুকালের পুরনো পাতলা কাঠের খাপ। খাপটা এককালে চামড়ায় মোড়া ছিল। সে চামড়ার আবরণ আর অল্পই অবশিষ্ট আছে, কাঠ বেরিয়ে পড়েছে। বাঁটখানা সেকালে রূপো বা ওই রকম কোন ধাতুর ছিলকের মত পাতলা একটি আবরণ দিয়ে মোড়া ছিল। সেও এখন উঠে গিয়েছে। কিন্তু প্রায় আড়াই হাত লম্বা বাঁকানো ফলাটি বর্ষাকালের দুপুরবেলার পাতলা মেঘের রঙের মত ঝকঝক করছে। আলো জেলে বসে প্রহ্লাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘুরিয়ে দেখলে কোথায় মরচে ধরেছে। তেল দেওয়া ছিল। কিন্তু সে তেল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। দু-এক জায়গায় বিন্দু বিন্দু মরচে ধরেছে [illegible] কাঠের গায়ে ছাতার মত ফুটে উঠেছে।

কাপড় দিয়ে সযত্নে মুছে আঙুল বুলিয়ে ধার পরীক্ষা করে সে ইঁটের গুঁড়ি দিয়ে পরিষ্কার করলে, তারপর ধারে উখো বুলাতে লাগল হালকা হাতে।

এই তার বলির খড়্গা।

এ-ই তার মা-কালীকে এনেছে তার ঘরে। এই তলোয়ারখানা যেমন জাগ্রত, তার মা-কালীও তেমনই জাগ্রত। এই তলোয়ারে সে যখন বলি দেয় মায়ের কাছে, তখন মায়ের মাটির জিভ—যা আজ জলে গলে গেল, সেই জিভ লকলক করে। হায় দারোগা, তুমি যদি দেখতে! তোমাকে দেখাবে, প্রহ্লাদ সে দৃশ্য তোমাকে দেখাবে। প্রহ্লাদ তলোয়ার তুলবে—তুমি দেখতে পাবে চোখের সামনে, অন্ধকারের মধ্যে রাঙা জিভ লকলক করে নাচছে। ইয়া! হা-হা-হা! উঠে দাঁড়াল সে!

তলোয়ারখানা হাতে নিয়ে নাচাতে লাগল। সিদ্ধ তলোয়ার! হা—ইয়া—আবা—বা—বা!

এইখানি পেতে গিয়ে সে মা-কালীকে পেয়েছে। এই তার মায়ের ঘরের চাবিকাঠি। সব তার মনে পড়ছে।

শেয়ালদহড়ার নিবিড় জঙ্গল। লোকে বলে, সুন্দরবন—নাকি খুব বড় বন। নিবিড় গভীর প্রকাণ্ড। হতে পারে। সে প্রহ্লাদ দেখে নি। কিন্তু তিন দিকে আঁকাবাঁকা খাল—খালের কিনারায় দুর্ভেদ্য কেয়া-গাছের ঘের, তার মধ্যে সেই জঙ্গল! অর্জুন, জাম, বনশিরিষের লম্বা গাছ দু-তিন হাত চার হাত অন্তর ঘেঁষাঘেঁষি করে জন্মেছে; দিনের বেলায় থমথম করছে দরজা-জানলা বন্ধ ঘরের অন্ধকারের মত ছায়া; ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ। শুধু ডাকছে ঝিঁঝিঁ,—ঝিঁ-ঝিঁ—ঝিঁ-ঝিঁ—। কখনও কখনও ঝটপট শব্দে উড়ছে বাদুড়; কখনও আকাশপথে সাঁ-সাঁ শব্দ তুলে এসে বসছে শকুন। গাছের মাথা দুলে উঠছে। পথের ধার থেকে সরু ফালি রাস্তা ধরে গিয়ে ঠিক মাঝখানে পাওয়া যেত—এখনও পাবে—পরিচ্ছন্ন স্থান। তারই মধ্যে খান তিনেক চালা ঘর। সেখানে আছে শ্মশানবাসিনী কালী।

শিবের বুকের উপর সামনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আজও আছে।

এখন প্রহ্লাদের বয়স সাড়ে তিন কুড়ি। তখন ছিল আঠারো, দুই কম এক কুড়ি। আড়াই কুড়ি—পঞ্চাশ আর দুই, ঠিক বাহান্নো বছর আগে মা-কালীর পাশের চালায় থাকতেন হাঁটুর উপর থেকে কাটা সওয়া চার হাত লম্বা ফৌজদার-বাবা সাধু। কাজ করতেন পল্টনে। লড়াইয়ে পায়ে গুলি-গোলা লেগেছিল, পা-খানা কেটে দিয়েছিল পল্টনের ডাক্তার। ফৌজদার বাবা বলতেন, ঠেঙো লাগায়কে সেই সন্ন্যাসী হইয়ে গেলাম। শুধু সঙ্গে ছিল এই তলোয়ার-খানা। বহু জায়গা ঘুরে ফৌজদার-বাবা এই শেয়ালদহড়ার জঙ্গলে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। এরও বহুকাল আগে কোতলঘোষার ঠাকুরেরা এইখানে শ্মশানকালীর আরাধনা করতেন। ফৌজদার-বাব৷ আস্তানা গেড়ে এই শ্মাশনকালীর মূর্তি গড়ে মাকে নিয়ে সাধন-ভজন করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন।

প্রহ্লাদের তখন আঠারো বছর বয়স। বাবা একদিন বললে, পুজো দিতে যাব শেয়ালদহড়া। কাল সকালে খাবি না।

শেয়ালদহড়া দু ক্রোশ পথ। সকালবেলা—'এই বেলা তখন এক প্রহর'। আষাঢ় মাস, এক প্রহরেই ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। শেয়াল-দহড়া তখন যেন আরামের দুপুরে ঘুমের শয্যা পেতেছে। ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। দু-চারটে ছোট পাখি বনচড়ুই চিক-চিক করছে। থমথম করছে ছায়া। দূর আকাশে চিল ডাকছে। ঢুকেই দেহ-মন জুড়িয়ে গেল। আরও ভিতরে এসে ওই সামনে-ফিরে-দাঁড়ানো শ্মশানবাসিনী মাকে আর সন্ন্যাসীকে দেখে শরীরের রোম মাথার চুল যেন খাড়া হয়ে উঠল। 'ইয়া! কালী কালী বল মন'।

ঠেঙো বগলে ফৌজদার-বাবা যখন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ওই লম্বা গাছগুলো যেন খাটো মনে হয়েছিল প্রহ্লাদের। এত বড় একটি মানুষ দেখে তার যত বিস্ময় হয়েছিল তত হয়েছিল উল্লাস। ভয় তার তখন থেকেই নেই।

ফৌজদার-বাবা বিনাবাক্যব্যয়ে পূজো নিলেন। মদের বোতল নিবেদন করে নিজের পাত্রে ঢেলে নিয়ে বাকিটা দিলেন তাদের বাপ-বেটাকে। পূজো শেষ করে বলি। তার বাবা একটা বড় পাঁঠা নিয়ে গিয়েছিল সেদিন। সেকালে পাঁঠার ভাবনা ছিল না। বিশেষ করে তাদের। তার বাবা আর সে—দুজনে কার-না কার পাঁঠাটা ধরেছিল, বাবা দিয়েছিলেন বলি এই তলোয়ারে।

খাঁড়া একখানা ছিল কালীর ঘরে, সে খাঁড়ায় বলি দিত ছেত্তাদার—পর্বে-পার্বণে কালীপূজোয় সে ওখানে আসত। তখন ফৌজদার-বাবা বলি করতেন না।

এই তলোয়ারখানা দেখে সেই প্রথম দিনেই প্রহ্লাদের প্রাণটা কেমন করে উঠেছিল। আঃ! ওইখানা যদি সে পায়! লম্বা! সরু! বাঁকানো! স্থচলো ডগা! হায় হায় হায়! ওখানা হাতে পেলে যমকে যে বলা যায়—এস দেখি, তুমি হার কি আমি হারি!

সাঁ শব্দে বাতাস কেটে ঝিলিক হেনে নামল, ঝপ করে একটা শব্দ হল, পাঁঠাটা কেটে দু ফাঁক হয়ে গেল।

তার তিন দিন পর সে বেরিয়েছিল প্রথম ডাকাতিতে।

তার বাবা তাকে সেদিন প্রচুর মদ খাইয়েছিল। তবু বুকের ভিতর পড়ছিল যেন ঢেঁকির আঘাত। বুকের পাঁজরা দুখানাকে কপাটের মত যেন ভেঙে ফেলবে। আষাঢ় মাস, আকাশে মেঘ, গাঢ় অন্ধকার। তারই মধ্যে নিঃশব্দে তারা চলেছিল। হঠাৎ জ্বলে উঠল মশালের

আলো, আবা-আবা শব্দে গাছপালার পাতা, বন্ধ দরজা উঠল কেঁপে, কটা বাদুড় উড়ে গেল সেই শব্দে, গৃহস্থের দরজায় পড়ল দুমদাম শব্দে ঘা, ঘরের ভিতরে জেগে উঠল ভয়ার্ত কান্না। ওদিকে তার বাবার হাতে লাঠি খেলে উঠল, হাঁক পড়ল ফেটে, আ—! বাস্, প্রহ্লাদের ভয় ভেঙে গেল। কিন্তু সারাক্ষণ মনে হল, ওই ফৌজদার-বাবার অস্ত্রখানার কথা। এই মশালের আলোয় যদি সেই অস্ত্রখানা খেলত তার হাতে! ঝকমক—তার ছটা ঝকমক করে চারিদিকে ঠিকরে পড়ত। ওই দূরে এখানে ওখানে যারা দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে, মধ্যে মধ্যে লুকোচ্ছে, তাদের দৃষ্টি ঝলসে যেত, এই ছটার আঁচে তাদের গায়ে তাত লাগত।

তলোয়ার সে একখানা যোগাড় করলে। বেশ মজবুত জিনিস, লোকে তারিফ করলে। কিন্তু তাতে প্রহ্লাদের মন ভরল না।

কি নেশাই লেগেছিল।

প্রহ্লাদের পরিবারের নেশা—নারীর নেশাই সবাই জানে। সবাই বলে। সাত জন পরিবারের কথা ফলাও করে বলে, বারো জন। তা ছাড়াও মেলায় বাজারে পথে-প্রান্তরে কত নারীর সঙ্গে দেখা তার হয়েছে, সে সবকে কেউ ধরে না। ক্ষণিকের দুঃখের মত, ক্ষণিকের সুখের মত তারা এসেছে, চলে গিয়েছে। কিন্তু এই তলোয়ারখানির নেশা তার ওই নারীর চেয়েও অনেক বড়, অনেক গাঢ়।

নারীর নেশা বলছ?

হাঃ! একজন যখন এসেছে তখন মনে হয়েছে, ধুলোর মুঠো বুঝি সোনা হয়ে গেল। তারপর যখন সে মুঠোর মেয়ে হারাল, চলে গেল কি মরে গেল তখন মনে হয়েছে—তার দাম ছিল ওই ধুলোরই দাম।

আবার পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে নতুন মানুষ। বাসিনী প্রথম ধুলোর মুঠো, তারপর শক্তি, তারপর সুধা—সেই সদ্‌জাতের মেয়ে, তার তিন ছেলের মা, তারপর সরোজিনী—তারপর আরও তিন জন। সাত মুঠো ধুলো।

কিন্তু এই তলোয়ারের নেশা! তোমরা জান না। জানবে কি করে? তলোয়ার কি ধরেছ? তা ছাড়া, প্রথম দৃষ্টিতেই যেন প্রহ্লাদ বুঝতে পেরেছিল, ওই থেকেই সে পাবে তার মা-কালীকে।

এই নেশাতেই মধ্যে মধ্যে সে যেত শেয়ালহদড়া। বলি নিয়েই যেত। এবং অ-পার্বণ অ-বার দেখে যেত। যাতে ছেত্তাদার না থাকে, ফৌজদার-বাবা নিজে বলি করেন। ফৌজদার-বাবা তো এখানা নইলে খাঁড়া ছোঁবেন না।

একদিন সে ছুঁতে চেষ্টা করেছিল। নেড়ে দেখতে চেয়েছিল। বাবা গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, মৎ ছোঁও।

পিছিয়ে গিয়েছিল সে ভয়ে।

আসা-যাওয়ার ফলে ফৌজদার-বাবার সঙ্গে তার যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল। বাবা তাকে যেন ভাল বেসেছিলেন। জেনেছিলেন —প্রহ্লাদ ডাকাত, তবু স্নেহ করতেন।

বাবা তাকে বলেছিলেন, এই তলোয়ার দিয়ে অনেক লড়াই করেছি। দুষমণের মাথা নিয়েছি, কলিজা দু ফাঁক করেছি। সামনা-সামনি লড়াই। ডাকাইতি না। এখন কালীমায়ীর কিরপায় মায়ের কাছে দিই বলি। ই তুম মৎ ছোঁও।

প্রহ্লাদের মনে সেদিন আঘাত লেগেছিল। মনে মনে রাগ হয়েছিল। প্রহ্লাদ তখন এ-অঞ্চল-বিখ্যাত প্রহ্লাদ। এ অঞ্চলের রাত্রির অন্ধকার প্রহ্লাদের কণ্ঠস্বর শুনে তখন কাঁপে। ছেলেরা ভয়ে

ঘুমোয় না। চুপ করে জেগে পড়ে থাকে। বলেছি তো, ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী তার পদশব্দ শুনে বুঝতে পারত—প্রহ্লাদ আসছে, তারা ভয় পেয়ে সরে দাঁড়াত। ওই আকাশের ভুলকো তারাকে জিজ্ঞাসা কর, ওই সাতভেয়েকে শুধাও, তারা দেখেছে। প্রহ্লাদ কতদিন রাত্রে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, কত রাত্রি? তিন প্রহর? তারা ঝিলিক মেরে বলেছে, হ্যাঁ।

ফৌজদার-বাবার কথায় সেদিন তার রাগ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ওকে রাত্রে কেটে দু ফাঁক করে দিয়ে যদি তলোয়ারখানা নিয়ে যায়, তবে কি হয়? কে রুখতে পারে তাকে?

ফৌজদার-বাবা বলেছিলেন, এ তলোয়ার মায়ের কাম ছাড়া আর কোন কামে চলবে না। ফৌজদার-বাবা বলে গিয়েছিলেন, কত লড়াইয়ে কত জোয়ানের মাথা কেটেছে এ তলোয়ার। ইজিপ্টে, মণিপুরে আফগানিস্তানে, বার্মায়। ইজিপ্ট ফরাসী দেশের এক সাহেব কাপ্তান সাব, তার মাথাটা কেটেছিলাম এক কোপে। মুণ্ডুটা এনেছিলাম, মেডেল মিলেছিল।

প্রহ্লাদ দিন কয়েক অস্থির হয়ে উঠেছিল।

ওই তলোয়ারখানা না হলে পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া হল না তার। বার বার মনে হল, রাত্রে গিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে খুন করে নিয়ে আসে অস্ত্রখানি। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রখানি! খুন করতে হবে। না হলে এমনি চুরি করে আনা চলবে না। আনতে হয়তো পারা যায়, কিন্তু ফৌজদার-বাবা ছাড়বে না। সে ঠেঙো বগলে এসে হাঁক মেরে পড়বে। হয় দাঁতে কুঠো করে তলোয়ার ফিরিয়ে দিতে হবে, নয়তো

সে এবং ফৌজদার-বাবা দুজনের একজনকে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে খুন করে আনাই ভাল। কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—

সহস্র 'কিন্তু' তাকে অস্থির করে তুলেছিল। বাড়ি থেকে রাত্রে বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। ওই 'কিন্তু' তার গতি রোধ করে দাঁড়িয়েছে। সে ফিরে এসেছে।

এই অস্থির অবস্থার মধ্যে সহসা একদিন সে স্থির হয়ে দাঁড়াল, একটা স্বস্তির গভীর আশ্বাসে লম্বা নিশ্বাস ফেললে। হ্যাঁ, পথ সে পেয়েছে। সে কালীপূজো করবে। কালী-মায়ের কাম ছাড়া আর কোন কামে তলোয়ারখানা যদি নাই চলে, তবে কালীপূজোই সে করবে। কালীপূজো এলেই সে যাবে পা-কাটা ফৌজদার-সাধুর কাছে। বলবে, কালীপূজোর কামে লাগবে, দাও ওই তলোয়ার-খানা। তখন যদি না দেয়, তবে তার আর কোন দোষ থাকবে না। বুড়োকে খুন করতে হয়, খুন করেই কেড়ে আনবে সে। সে জানে, তখন কোন 'কিন্তু' আর পথে দাঁড়াবে না।

সকালবেলা উঠেই সে বলেছিল, কালীপূজো করবে সে।

কালীপূজো অর্থাৎ হৈমন্তী অমাবস্যার ঠিক দুদিন আগে। চারি-দিকে ঢাক বাজছে কালীপূজোর। রতিলাল মিস্ত্রীকে গিয়ে বলেছিল, প্রতিমা চাই, কাল সন্ধ্যের মধ্যে।

—কি করে হবে প্রহ্লাদ ভাই? আমার হাতে যে তিরিশখানা প্রতিমা। এখনও খড়ি শুকোয় নি। সব কখানাই রঙ করতে বাকি। তুমি দেখ, বিচার কর।

—আমাকে স্বপ্ন হয়েছে। পূজো আমি করব। পিতিমে আমার চাই-ই।

—কিন্তু কি করে হবে, তুমি বিচার করে বল?

বিচার ? বিচার করতে প্রহ্লাদ জানে না। এ জীবনে প্রহ্লাদেরই বিচার হয়ে এল, একবার দুবার নয়, বিশবার পঁচিশবার চালান সে গিয়েছে। বার দশেক ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্ট, বার ছয়েক দায়রা-আদালতে তার বিচার হয়েছে। বাকি কবার পুলিসী বিবেচনায় খালাস পেয়েছে। বিচার কি আছে এর মধ্যে ? তার যে চাই।

—তোমার পায়ে ধরছি আমি।

তবে আর কি করবে প্রহ্লাদ ? কিন্তু তার যে চাই। এবং যার কাছে যাবে সেই তো এমনি করে পায়েই ধরবে। তা হলে প্রহ্লাদের কি হবে ? প্রহ্লাদ যা চায়, তা পাবে না ? তবে আর সে প্রহ্লাদ কেন ?

—আচ্ছা একটা ঠাট, তু করে দে। তারপরে আমি দেখব।

রতিলালের ছেলে একটা কাঠামো বেঁধে দিয়েছিল। সেই কাঠামো এনে তুষ-মাটি লাগালে, আগুন জেলে তাকে শুকলে, তার-পর ন্যাকড়া দিয়ে কাদা দিয়ে মুখ বসালে। মুখ একটা এনেছিল রতিলালের বাড়ি থেকে। তাকে শুকিয়ে, রতিলালের বাড়ি নিয়ে গেল—দে, রঙ দে। আমি সন্ধ্যেবেলা নিয়ে যাব।

তারপর আয়োজন হল। কালীপূজোর দিন বেলা তখন অপরাহ্ণ। এল তার শিষ্যেরা বন্ধুরা। উপকরণ এল। কে কোথা থেকে কি নিয়ে এল কে জানে! তবে এল। প্রহ্লাদ স্বপ্ন দেখেছে। কালী-মা স্বপ্ন দিয়েছেন। এতে কি অভাব ঘটে।

স্বপ্ন সে দেখেছিল। নিশ্চয় দেখেছিল। ভেবে ঠিক করেছিল, হঠাৎ মনে হয়েছিল—ওটা ঠিক নয়, ভুল বলেছে সে। নিশ্চয় ভুল। স্বপ্নই দেখেছিল সে। মা-কালীই তাকে স্বপ্নে বলেছিলেন, আমাকে পূজো কর্, ওই তলোয়ার তুই পাবি। না দেয়, কেড়ে নিয়ে আসবি।

অন্য কালী নয়, ও শেয়ালদহড়ার শ্মশানবাসিনী কালী, যিনি শিবের বুকের উপর সামনে ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই। স্বপ্ন দিয়েছিলেন। কোন ভুল নাই।

পূজোর পর সে ফৌজদার-বাবার কাছে গিয়েছিল।

—কেয়া রে বেটা পহ্লাদিয়া*? এবার পূজাকে সময় আসলি না? সন্ন্যাসী আহ্বান করেছিলেন।

—পাঁঠা তো পাঠিয়েছিলাম বাবা।

—হ্যাঁ। তু আসলি না কাহে?

—আমি এবার ঘরে মার পূজা এনেছি বাবা।

—হঁ্যা! মায়ীকে পূজা? মায়ীকে নাম কি রে? ডাকাতিয়া বেটা?

প্রহ্লাদ চেপে বসল ভাল করে। বেশ দৃঢ়স্বরে বললে, এবার কিন্তু ওই হেতেরখানি আমাকে দিতে হবে বাবা।

—কী? হাতিয়ার? তলোয়ার?

সন্ন্যাসী খাড়া হয়ে বসলেন। একটা হাঁটু মুড়ে, কাটা পাখানা-মাটির উপর গেড়ে।

প্রহ্লাদ হাত যোড় করে বললে, ওখানি আমার চাই বাবা। তোমার চরণে ধরছি। তুমি যা বলেছ—কালীমায়ের কামেই লাগবে।

প্রহ্লাদের চোখ কিন্তু চরণের দিকে ছিল না। মুখের দিকে ছিল। স্থিরদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর চোখে চোখ মিলিয়ে বসে ছিল। সে দৃষ্টিতে কোন কুণ্ঠা ছিল না!

—ওখানি আমায় দিতে হবে।

—নেহি। একটা হাঁড়ি মুখে দিয়ে যেন সন্ন্যাসী কথা বললেন।

—সে আমি শুনব না বাবা। প্রহ্লাদের কণ্ঠস্বরে এবার চড়া সুর

বেজে উঠল। প্রতিটি কথা পর্দায় পর্দায় চড়ে গেল।—আমি কালী পুজো করেছি, কালীমায়ের কামে লাগবে। আবার খাদে নামল গলা—না দিলে আমি নিয়ে যাব।

—আরে বেটা চোর!

—না বাবা, চুরি আমি করি না। আমি ডাকাত। তোমার সঙ্গে লড়ে নিয়ে যাব। আমাকে তুমি পারবে না। তুমি বুড়ো হয়েছ, একটা পা তোমার নাই। আমি এই মায়ের সামনে বলছি, ডাকাতিতে কি পাপ কাজে এ হেতের ামি ধরব না।

সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, আচ্ছা, এবার কালীপূজো তো হয়ে গেল। আসছে কালীপূজায় নিস।

এ যুক্তির সামনে প্রহ্লাদ যেন দুর্বল হয়ে গেল। বললে, না। তুমি সরিয়ে ফেলবে।

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী, আরে ছোটা আদমী! যখন বলেছি তোকে দেব, তখন দোব। না হলে না লড়ে দিতাম না।

পনের দিন পর আবার এল প্রহ্লাদ।

—বাবা, আমি কালী পিতিষ্ঠে করছি, ভাসাব না আর! চল, তোমাকে যেতে হবে। কাল পুণ্যিমেতে পিতিষ্ঠে করব।

ফৌজদার-বাবা তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন, তারপর খাপসুদ্ধ তলোয়ারখানি বার করে তার হাতে দিলেন।

সে আজ কুড়ি বছর আগে।

তার আগে বত্রিশ বছর ধরে এই অস্ত্রখানি পাবার জন্য অধীর অস্থির হয়ে কাল কাটিয়েছিল সে। এর মধ্যে সে মেয়াদ খেটেছিল

তিনবারে এগারো বছর। জেলের মধ্যেও সে এরই কথা ভাবত। সান্ত্রীদের বন্দুকের ডগায় লাগানো কিরিচ দেখে হাসত।

মা-কালী এসেছেন আজ কুড়ি বছর।

অমাবস্যায় সংক্রান্তিতে সে বলিদান করেছে। ফৌজদার-বাবার সিদ্ধ তলোয়ার! এই তলোয়ারে যখন বলি হয়, মা-কালীর জিভ লক্‌লক্ করে। এই তলোয়ারের বলি নিতে তার ওই মা-কালীকে জাগতে হয়েছে। তার মা-কালী খেলার পুতুল নয়। এই তলোয়ার নিয়ে কখনও সে ডাকাতি করে নি। লাঠিই নিয়ে গিয়েছে। তারপর বোধ হয় দুবার সে ডাকাতি করেছে। আর না। সেই খতম। এই অস্ত্রখানা ধরতে পারে না বলেই ছেড়ে দিয়েছে। আঠারো বছরের মধ্যে ও-কাজ সে করে নি। চোলাই মদ বেচে খায়। চোরাই গাজা বিক্রি করে।

ওই হাতিয়ার আর মা-কালী। মা-কালী আর ওই হাতিয়ার। কি হল তার কে জানে! স্ত্রীর নেশা, স্ত্রীলোকের নেশা, সংসারের নেশা—সব গেল। যাক। জয়-মা-কালী! ভালই হয়েছে। সদানন্দময়ী কালী!

সেই রাত্রে সে তলোয়ারখানা হাতে নিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল। কেউ নাই তো? দারোগা, কি কেউ? লম্বা কালো কেউ? না। এবার সে নাচতে লাগল। অন্ধকার উঠানে—সেই অঙ্গহীনা কালীমূর্তি আর তার সামনে সে। ঘুরতে লাগল তলোয়ার। জয় মা-কালী! জয় মা-কালী! ইয়া—

—কে?

অন্ধকারে একটা দীর্ঘাকৃতি লোক এসে কখন দাঁড়িয়েছে

প্রহ্লাদ খেলতে খেলতেই দেখলে। থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, কে?

দারোগা? এসেছে রাত্রে চুপিসাড়ে তার সন্ধানে, কি করছে তাই দেখতে? প্রহ্লাদ হাঁপাচ্ছে। মনে ছিল না, এতটা বয়স হয়েছে। কিন্তু আজ সে ছাড়বে না। শক্ত মুঠিতে তলোয়ার ধরে সে দাঁড়াল। পিস্তল আছে দারোগার। কিন্তু পিস্তল তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটবে। মাঝপথে গুলি খেয়েও গিয়ে বসাবে কোপ। জয় মা-কালী!

আবার হেঁকে উঠল প্রহ্লাদ, কে?

—আমি।

—কে? চমকে উঠল প্রহ্লাদ। দারোগা তো নয়! থরথর করে মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল সে। তার পরেই হিংস্র হয়ে উঠে বললে, ঘনা?

—হ্যাঁ। আমি ঘনশ্যাম। হাসতে লাগল ঘনা। এ অঞ্চলের নতুন প্রহ্লাদ, নতুন নায়ক। ঘনার ধন্য জীবন। ঘনা ডাকাতি করে। ঘনা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাতে থাকে। ঘনা ধান লুঠ করে। ঘনা ফেরারী আসামী। ঘনার অনেক হাতিয়ার আছে—লাঠি, ছোরা, সড়কি, একটা ভাঙা বন্দুক। কন্তু তবু ঘনার লোভ আছে এই তলোয়ারখানির উপর। কতদিন এসেছে। বলেছে, দাও ওখানি।

প্রহ্লাদ তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। না। ও আমি দোব না। আমি মরবার সময় তোকে দিয়ে যাব।

এই কারণেই প্রহ্লাদ এটিকে এত যত্নে লুকিয়ে রাখে। নইলে পুলিসের ভয় এত করে না। ঘনা এতদিন সাহস করে নি। প্রহ্লাদ বড় বাঘ। সাহস করে নি। প্রহ্লাদ হেসেছে। কিন্তু ঘনার চোখের দৃষ্টি থেকে সতর্ক হয়েছে। এ দৃষ্টি সে চেনে, জানে।

ঘনশ্যাম বললে, যাচ্ছিলাম এইদিকে। রাত্রি ছাড়া তো চলি না, সে তো জান!

হাসলে সে। অন্ধকারেও সাদা দাঁতগুলো দেখা গেল। বললে, দেখলাম বাতাসের সঙ্গে তলোয়ার খেলছ। তাই দেখতে এলাম।

—দেখতে এলি?

—হ্যাঁ। এইবার ওখানি যে আমার চাই।

—না।

—'না' বললে তো শুনব না। ওখানি আজ নোব। এমনি যদি দাও তো দশটি টাকা দোব।

—না—না—না। চীৎকার করে উঠল প্রহ্লাদ।

হা-হা করে হেসে উঠল ঘনশ্যাম। সে কি একটা বের করলে। কি ওটা? পিস্তল? তবু ঘনার এই তলোয়ারখানা চাই? চাইবে বইকি! এ যে সাধুবাবার সিদ্ধ তলোয়ার। কিন্তু জীবন থাকতে প্রহ্লাদ ওটা দেবে না।

'আ—' শব্দে চীৎকার করে তলোয়ার তুলে সে ছুটল। ঘনশ্যাম ক্ষিপ্রগতিতে পাশে সরে দাঁড়াল। তারপর হাতটা তুললে। হাতে পিস্তল।

ওদিকে প্রহ্লাদ আবার ঘুরেছে। মারলে কোপ।

ঘনশ্যাম সরে গিয়েও আর্তনাদ করে উঠল। চাপা যন্ত্রণাকাতর এক টুকরো শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর কঠিন শব্দ হল একটা।

নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় টলতে টলতে প্রহ্লাদ কি একটা পেলে, সেটাকেই ধরলে আঁকড়ে। হাত থেকে খসে পড়ে গেল তলোয়ারখানা।

ঘনশ্যাম তলোয়ারখানা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। খোঁড়াচ্ছে সে। প্রহ্লাদের কোপটা সরে যাওয়া সত্ত্বেও পায়ের আঙুলে পড়েছে।

প্রহ্লাদের মনে হল, সব অন্ধকার, কালো কালী-মা-ও সে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছেন। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, লম্বা পা ফেলে, হাতে খাঁড়া নিয়ে ওই যে যাচ্ছেন, ঘনশ্যামের সঙ্গে চলে যাচ্ছেন। মা-কালী, মা-কালী চলে যাচ্ছেন। তাঁর মুখে হিংস্র হাসি, লকলক করছে জিভ। চলে যাচ্ছেন।

এটা ? এটা কি ? মাটির মা-কালীটা ? প্রহ্লাদ টলতে টলতেও নিষ্ঠুর আক্রোশে মূর্তিটাকে আঁকড়ে ধরে পিষতে লাগল। তারপর মনে হল পৃথিবীটা উল্টে যাচ্ছে। সে মাথা নীচু করে অন্ধকার অসীম শূন্যলোকের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে, কার্তিক মাসের আকাশের খসা তারার মত।

পরদিন সকালে দারোগা দেখলেন, অজ্ঞান প্রহ্লাদ, ভাঙা কালী। আর দেখলেন দুটি বলিষ্ঠ পদচিহ্নের সঙ্গে একটি রক্তের ধারা চলে গেছে।

জানুতে গুলি বিঁধেছে প্রহ্লাদের।

জ্ঞান হল হাসপাতালে।

—কি হয়েছিল ? কে গুলি করলে ?

প্রহ্লাদ বললে, কালী, মা-কালী।

শিলাসন

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

বর্তমান কথা সে মহাভারতের কথা নয়, নব ভারতের কথা। এক দিকে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্গঠন আর এক দিকে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যে ভারতে হচ্ছে, সেই ভারতের কথা।'

ভূতত্ত্ববিৎ এবং মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার মুখের চুরুটটি নামিয়ে রেখে বেশ আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন—চেষ্টা করলেন নৈমিষারণ্যে মহাভারতবক্তা সৌতির মতই মুখভাবকে পবিত্র এবং দৃষ্টিকে স্বপ্নপ্রবণ করে তুলতে।

এতক্ষণে আমি আশ্বস্ত হলাম। কিছুদিন থেকেই শুনছিলাম, বিদগ্ধ জনেদের মধ্যেও যিনি নাকি বকের মধ্যে হংসতুল্য বিদগ্ধ, যাঁর নাসা উচ্চ, ওষ্ঠ বক্র, বাক্‌বিস্তারভঙ্গী তীর্যক এবং তীক্ষ্ণ, যাঁর দুটি চোখের একটি অহরহই কৌতুকে চঞ্চল এবং অপরটি উজ্জ্বল, মনে-প্রাণে বিজ্ঞানবাদী, বিলেতে-পাস মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার সেই অমল চৌধুরীর নাকি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পরিবর্তন এমন যে দেখে পুরানো মানুষটিকে নাকি চেনবার উপায় নেই। লম্বা একটা পর্যটন সেরে এসেছে সম্প্রতি এবং সেই থেকেই এমনটা ঘটেছে। শুনেছিলাম অনেকের কাছেই কারুর সঙ্গে নাকি দেখাও বিশেষ করে না। অবশেষে একদিন কৌতূহলী হয়ে নিজেই গেলাম। চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। শীর্ণ হয়ে গেছে অমল। দীর্ঘ পথশ্রমের চিহ্ন তো বটেই, তারও উপরে যেন কিছু আছে। পরিবর্তন বাইরে থেকে সত্যিই সুস্পষ্ট। আমি সরাসরিই প্রশ্ন করলাম। অমল হাসলে।

এ হাসিও তার মুখে নূতন। কিন্তু এতক্ষণে এই কথাগুলি শুনে আশ্বস্ত হলাম! বাক্‌ভঙ্গীর বক্র বিস্তার-গতি এবং তীক্ষ্ণমুখিত্ব ঠিকই আছে; বসবার ভঙ্গীতে তার অভিনয় প্রচেষ্টাতেও পুরনো অমল চৌধুরী ফিরে এসেছে।

পরিবর্তনের কথাসূত্রেই কথাগুলি অমল বলছিল। সে স্বীকার করলে, একটা পরিবর্তন তার হয়েছে। তার মন বুদ্ধি বিদ্যা সমস্ত-কিছুর উপর একটা ঘটনার এমন প্রবল প্রভাব পড়েছে যে, এ পরিবর্তন তার অবশ্যম্ভাবী। একে অতিক্রম করার তার সাধ্য নেই। বললে, আমি ভাবছি। বসে বসে ভাবি, ধ্যান করি—বললে আশ্চর্য হয়ো না যেন। ধ্যান করি।

বললাম, বল কি? তা হলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় কি? তুমি ধ্যান কর? কার?

অমল বললে, আগে শোন। অন্য কাউকে এ ঘটনার কথা বলি নি। তুমি সাহিত্যিক বলে বলছি। তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। এ ধ্যান কারও ধ্যান নয়, কিছুর ধ্যান। বলেই শুরু করলে, ভারতের ধ্যান, মহাভারতের কথা অমৃত সমান। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আশ্বস্ত হলাম তার বাক্‌ভঙ্গী শুনে।

অমল বললে, আগে শোন। তারপর হেসো। তোমার ঠোঁট দুটিতে চাপা হাসি খেলা করছে আমি দেখতে পাচ্ছি। জান বোধ হয়, দমোদরভ্যালি প্রজেক্টের একটা আশঙ্কা আছে। সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে, ভাল এবং মন্দ;—আশা এবং আশঙ্কা। মন্দ ফলের আশঙ্কার একটা হল দামোদর এবং তার সঙ্গে ছোট বড় নদীকে বাঁধ দিলে খনি-অঞ্চলে খনির ভিতরে জলের চাপ বাড়বে, যার ফলে, অনেক খনি হয়তো কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে। সেই

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ঘুরছিলাম। মোটা মাইনে পাই। কাজটা মাইনের পরিবর্তে—এটা ঠিক। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস কর যে, আমার আগ্রহ মাইনের বাটখারায় ওজন করা চলত না। যদি বল—খাঁটি চাকর, তাই বল। কিন্তু প্রভুদের সর্বতোভাবে মনোরঞ্জন করবার জন্যে বললে মারামারি করব। কারণ রিপোর্টে খনির মালিকদের সুবিধা করে দিতে কোন মিথ্যা বা কোন অতিরঞ্জন আমি করি নি। একটা অন্ধ সন্ধানের নেশা লেগেছিল আমার।

একখানা সর্বত্রগামী জীপ এবং তার সঙ্গে একটা ট্রেলার, তাতে জন তিনেক অনুচর ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ওই অঞ্চলে ঘুরছিলাম। এই অবস্থায় হঠাৎ একদা বাহন অর্থাৎ জীপ ওলটালেন। ছিটকে পড়ে অল্প অঘাত পেয়ে ড্রাইভার, আমি এবং একজন অনুচর ঝেড়েঝুড়ে উঠলাম; কিন্তু বাকী দুজন অনুচর বেশ আঘাত পেলে এবং বাহনও হল অক্ষম—চিৎ হয়ে উল্টে পড়া জীপ সোজা হল কিন্তু তখন তিনি চলচ্ছক্তিহীন।

আদিবাসীদের অঞ্চল। তিন দিকে ঘন অরণ্যে ঘেরা একটা পাহাড়ে জায়গা। ঠিক এই জায়গাটায় অরণ্য অবশ্য ক্ষীণ, শুধু শাল মহুয়া পলাশ গাছ ছড়িয়ে ছড়িয়ে জন্মেছে। একটা একটা পাথুরে টিলা—খানিকটা ঢাল, আবার একটা টিলা, মাঝখানে মাঝখানে ছোট একটা নালা বা কাঁদর, দু পাশের টিলার জল বেয়ে গিয়ে অনেকগুলোতে মিলেমিশে হয় বরাকর বা খুদে বা দামোদর মহারাজের কোন করদ নদীতে গিয়ে পড়ছে। বন যেখানে ঘন, সেখানটা বোধ হয় মাইল দশেক দূর। অনেক চিন্তা করে ঠিক করলাম, অচল বাহনটিকে ঠেলে পিছনে মাইল চারেক নিয়ে গিয়ে মেরামত করিয়ে নিক ড্রাইভার এবং ওখানেই জখম অনুচর দুজনের চিকিৎসা হোক। আমি ইতিমধ্যে একলাই এ অঞ্চলটা যথাসাধ্য ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে ফেলি। এইভাবে

পদব্রজে ঘোরার অভ্যাস আমার আগে থেকেই ছিল সে তথ্য অজানা নয় তোমার। এবং এক সময় ডিস্‌পোজালের ডিপোয় ডিপোয় ঘুরে অন্তত পঁচিশটে পঁচিশ রকমের ঝোলাই কিনেছিলাম—এমনইভাবে ঘুরব বলে। তেমনই ঝোলা একটা পিঠে বাঁধলাম। বগলে সন্ন্যাসীদের মত ঝুলিয়ে নিলাম ছোট একটা বিছানা। জামার তলায় কোমরে বেঁধে নিলাম আত্মরক্ষার সরঞ্জামের বেল্‌ট্—তাতে রইল একটি খোকা আগ্নেয়াস্ত্র, একটা ছোরা, কিছু বুলেট।

সুন্দর দেশ। অরণ্যে ঘেরা অঞ্চল এবং পাহাড়ে আমেজ। ঘন বন যেখানেই পাতলা হয়েছে, সেইখানেই ছোট ছোট বসতি গড়ে উঠেছে। আর্য-অভিযানের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দাও। তবে সভ্যতা যত এগিয়ে এসেছে, আদিবাসীরা তত পিছিয়েছে। বনের আড়াল দিয়ে বাস করেছে। কিন্তু এই অঞ্চলটি যেন অন্য অঞ্চল থেকেও পৃথক। সমস্ত পৃথিবী থেকেই বিচ্ছিন্ন।

ছোট ছোট গ্রাম। ছোট ছোট ঘর। কালো মানুষ। আচারে বন্য। বেশভূষায় আহারে অনেক কিছু এমন আছে যা নাকি বর্বর এবং অস্বাস্থ্যকর আমাদের বিচারে। বসতিগুলি বড় পরিচ্ছন্ন এবং স্বল্প বেশবাস ক্ষারে-কাচা পরিষ্কৃত কিন্তু ঘরগুলি ছোট, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নেই, সে দিক দিয়ে অস্বাস্থ্যকর। কাঁকুরে মাটির দেওয়ালের উপর শালের রোলা ও বাঁশের কাঠামোয় খড়ের চাল মূল্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ছবির মত সুন্দর। গোবর মাটিতে নিকিয়ে দেওয়ালের প্রলেপে এমন একটি মনোরম স্নিগ্ধ লাবণ্য ফুটিয়ে তুলেছে যে, চোখ জুড়িয়ে যায়, মনে হয়—অপরূপ! কারও কারও দেওয়ালের নীচের দিকে ভিতে সুকৌশল আঙুলের টানে ঢেউ খেলানো রেখা টেনেছে,

যা দেখে ঠিক মনে হয় তরঙ্গিত নদী ; তার ওপরে সারি সারি খেজুর-পাতার ঢঙে এঁকেছে গাছ—অর্থাৎ নদীর ধারে আরণ্য শোভা।

মানুষগুলি সরল সহজ এবং কণ্ট্রোলের বাজারে ও নানা রোগ-জর্জর কালেও স্বাস্থ্যসবল পেশীগুলি এমন দৃঢ় যে মনে হয় পাথুরে ভূমি প্রকৃতির প্রতিফলন পড়েছে। বনে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে, শাল-পাতা তৈরি করে, ময়ূর ধরে আনে, খোয়াইয়ের নীচের অংশে চাষ করে। অন্য অঞ্চলে এরা কয়লাখনিতে কয়লা কাটতে যায়, কিন্তু এ অঞ্চলে তেমন লোক চোখে পড়ল না। গায়ে একটা আরণ্য গন্ধ আছে যা কটু লাগে আমাদের। তা থাক্। কিন্তু মানুষদের মনগুলি সমতলের মত সরল এবং প্রশস্ত। কুমারী-ভূমির তৃণ-আস্তরণের মতই নরম।

এইখানেই ভয়। যে ভূমি কর্ষিত হয় নি, তার বুকের ঘাসের আস্তরণের মধ্যে চোরাবালি না হোক, চোরা পাঁক থাকে ; ঘাসের ভিতরে ফাটল থাকে ; অকর্ষিত ভূমির কন্দরে বিবরে সরীসৃপ বাস করে। এদের মন সম্পর্কে তাই আমি সাবধানেই ছিলাম। পা ফেলতাম অত্যন্ত সাবধানে। কোন অন্যায় অভিপ্রায়ও আমার ছিল না। শুধু লক্ষ্য রাখতাম, ওদের জীবনের কোন নরম জায়গায় পা না দিই। হঠাৎ কিছু বলে না ফেলি। ওদের ভাষাটাও আমি ভাল জানতাম।

তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াতাম দিনের বেলা।

ওরা জিজ্ঞাসা করত, ক্যানে ইসব শুধাইছিস, লিখে লিছিস ? কি করবি ?

আমি বুঝিয়ে দিতাম। কখনও বুঝতে পারবে না বলে উপেক্ষা করতাম না।

একদিন—

অমল চৌধুরী একটু সোজা হয়ে বসল, চুরুটটা তুলে দুটো বার

টান দিয়ে নামিয়ে রেখে বললে, একদিন সন্ধ্যার মুখে পেলাম এক-খানি গ্রাম। থমকে দাঁড়ালাম।

খানিকটা দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের ওপাশে আমার ম্যাপে আছে একটা পরিত্যক্ত খাদ দেখা যায়। ওই খাদের লাইন ধরেই সোজা আমি বেরিয়ে যাব। মাইল কয়েক গেলেই পাব দামোদর প্রজেক্টের খাস এলাকা। কাজ চলছে সেখানে। সে কাজ এখান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আমার বাহনকে উপদেশ দিয়েছি, পাকা সড়কে মাইল তিরিশেক ঘুরপথ দিয়ে ওই খাস এলাকায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। ওদিকে এই গ্রাম থেকে যেতে হলে ছোট একটা ঢিবির মত পাহাড়, পাহাড় এই অর্থে যে নিম্ন-ভূস্তরের পাথরের একটা স্তর কোন পুরাকালে কোন ভূকম্পনের বেগে উপরের স্তরগুলোকে ঠেলে খুদে বিন্ধ্যের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তার ওপাশেই সেই পরিত্যক্ত খাদটা।

পরিত্যক্ত খাদটার পরেই পাব একটি চালু খাদ। ইচ্ছা ছিল, সেখান পর্যন্তই কোন রকমে যাব। গেলে, আহার বিহার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারব। কিন্তু পথেই অনেক রাত্রি হয়ে গেল। বন্য জন্তুরও ভয় আছে, তার উপর আছে ওই পড়ো খানাটা। কোথাকার কোন গহ্বর কোথায় আছে, কে জানে! অগত্যা একখানা গ্রাম পেয়ে দাঁড়ালাম।

আদিবাসীদের ছোট্ট গ্রাম। সন্ধ্যার মুখ। সঠিক এবং স্পষ্ট সব কিছু দৃষ্টিগোচর হল না। তবে মনে হল, এ গ্রামটি যেন কিছু স্বতন্ত্র, এবং বিশিষ্ট। দেওয়ালের চিত্ররেখাগুলি শিল্পরীতিতে উন্নত। কয়েকটা ঘরের উঠানে দেখলাম মাটির পুতুল, মাটির পাত্র। চাক, অর্থাৎ কুম্ভকারের চাকও দেখলাম। প্রশ্ন জাগল মনে। এরা কি আদিবাসী নয়? কিন্তু মুলতুবী থাকল প্রশ্নটা। আপাতত আশ্রয়ের প্রশ্নটা বড়,

এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে, যারা নাকি সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে পথ চলতে না পেরে নীচের স্তরে পড়ে গিয়েছে, তাদের কোন্ জাতি, কি পেশা জিজ্ঞাসা করলে তারা পুরাতন ক্ষতস্থানে নূতন করে আঘাত পায়। কোন উচ্চ স্তরের অতিথি এ প্রশ্ন করলেই তাদের মনে সংশয় জাগে, ঘৃণা বা অবজ্ঞা করছে হয়তো।

গ্রামের মোড়লের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইলাম। মোড়ল সমাদর করে আশ্রয় দিলে। এ সমাদরও যেন বিশেষ ও স্বতন্ত্র। তার ঘরের সামনেই একটি পরিচ্ছন্ন এবং বেশ একটু সম্ভ্রান্ত ধরনের চালা। শাল কাঠের চাল, খড়দল চারিদিকে, শালকাঠের খুঁটি এবং বাঁশের তৈরি ঝাঁপে ঢাকা মেঝেটি গোবর-মাটিতে পরিচ্ছন্ন তকতকে করে নিকানো। সেইখানে থাকতে দিলে। ওইটি ওদের গ্রামের অতিথিশালা, চণ্ডী-মণ্ডপ, নাটমন্দির যা বল। মহুয়ার তেলের একটি বড় প্রদীপও জ্বেলে দিলে। তকতকে মেঝে আবার ঝাঁটা বুলিয়ে পরিচ্ছন্নতর করে দিলে, তারপর মোড়ল সেই স্থানটির উপর হাত রেখে বললে, অতিথ মহাশয়, এইখানে তুমি ঠাঁই নিয়ে বাস কর। অর্থাৎ উপবেশন কর। ঘন করে জ্বাল দেওয়া অনেকটা মহিষের দুধ চিঁড়ে গুড় এনে দিলে। হাতজোড় করে বললে, চিনি তো দেশে হয়েছে অতিথ মহাশয়, আর আমরা চিনি খাইও না। গুড় কি তুমি খেতে পারবে?

চিনি আমার সঙ্গে ছিল।

তারপর গল্প করলে। এরই মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে বুঝলাম, আমার দৃষ্টিতে আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। এরা অন্য গ্রামের আদিবাসী থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। এদের পেশা মাটির পাত্র ও পুতুল তৈরি করা এবং কাঠের কাজ করা—কুম্ভকার ও সূত্রধর একাধারে। চাষ

অবশ্য আছেই। শিল্পীর গ্রাম। আজ বলে নয়, মোড়ল বললে, সেই দেবতার কাল থেকে এরা শিল্পী।

দেবভাষায়, 'যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী' আর কি! অন্য পেশা এদের নাকি নিষিদ্ধ।

তারপর মোড়ল জিজ্ঞাসা করলে, তুমি, অতিথ মহাশয়, ওই বনে পাহাড়ে কোথা যাবে?

আমি অভ্যাসমত বোঝাতে লাগলাম, দামোদর উপত্যকার পরিকল্পনার কথা। খ্যাপা দামোদরকে বাঁধা হবে—।

গভীর মনোনিবেশ করে তারা শুনতে লাগল। শুনে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, দেবতা হে! তোমাকে নমো নম।

চমৎকার সে ভঙ্গীটা। উবু হয়ে বসে ছিল, কনুই দুইটি ছিল হাঁটুর উপর, হাত দুটি দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপরে তুলে করতল দুটি যুক্ত করে প্রণাম জানালে। মাটির দিকেই তাকিয়ে সে এতক্ষণ বোধ হয় আমার কথা শুনে সেগুলি কল্পনা করবার চেষ্টা করছিল। প্রণাম জানাবার জন্যেই মুখ তুললে। মুখ তুলেই প্রণাম শেষে সে সামনের গ্রাম্য পথের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, কে? উখানে এমুন করে দাঁড়ায়ে রইছিস গ?

কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। সে উত্তর দিলে, আমি গ।

—কে? কাঁদন? তু আলি কখন?

—এই আখুনি। ঘরকে আখুনও যাই নাই গ।

—যাস নাই? তা হোথা দাঁড়ায়ে কি করছিস গ?

—দেখছি। উ কে বেটে গ?

—অতিথ বটে। আয়, হেথাকে আয়, বস্। ভাল ছিলিস গ?

—হঁ্যা। ছিলম।

লোকটি এগিয়ে এসে দাঁড়াল। স্বল্পজ্যোতি প্রদীপের আলো, জ্যোতির মাপে একটা বাতির আলোর বেশি নয়। তাও আমার সামনে চোখে চশমা, বাতির ছটা চশমায় পড়েছে। লোকটি ভাল নজরে এল না। তবে বেশ লম্বা মানুষ—সবল দৃঢ়।

মোড়ল বললে, অতিথ মহাশয়, এই মানুষটা আমার জামাই বটে গ। তুমি যি সব কথা বলছ, উ সি সব ভাল বুঝে। কুঠিতে কুঠিতে খেটে বেড়ায়। শহর দেখেছে, রেলে চড়িছে, অনেক দেখেছে গ। কত বারণ করি, আমাদের জাতকর্ম্ম দেবতার আদেশ অমান্য করতে নাই। তা মানে না। তা কী বলব?

কাঁদন, ওই নামেই মোড়ল ওকে ডেকেছিল, সে চলে গেল, বললে, চললাম আমি গ।

—দেখলে মহাশয়! আমার বেটাটি ভাল, ললাট মন্দ, কি করব? দেবতার কথা তো মিথ্যা লয় অতিথ। ই হবে। সে হাসলে।

বুঝলাম, সনাতন ভারতের বাণী। কলিশেষে, বুঝেছ না?

* * *

পরদিন সকালে।

আটচল্লিশটা খোপরওয়ালা ব্যাগটা পিঠে বেঁধে, কোমরে পিস্তলের বেল্ট এঁটে বেরুবার সময় মনে হল, এক দিন থেকে যাব। ওই যে চালটা, তার শালকাঠের বড়দলে বাটালি হাতুড়ির কাজ দেখে বিস্ময় জন্মাল আমার। সবচেয়ে বিস্ময় বোধ করলাম কিসে জান? চারিদিকের বড়দল কারুকার্যে ভরা কিন্তু কোথাও লতা নেই, পাতা নেই, ফুল নেই, পাখী নেই, জন্তু জানোয়ার নেই, আছে শুধু মানুষের মুখ—সারি সারি মানুষের মুখ। অবশ্য সবই এক ছাঁচ। যা অবশ্যম্ভাবী আর কি! বোধ হয় ওই একটা মুখই আঁকতে শেখে শিল্পীরা। যাক। সময় নেই। মোড়ল

এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছে বিদায় নিয়ে বের হলাম। মোড়ল গ্রামের ধার পর্যন্ত এল। হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বললে— অপরাধ নিয়ো না অতিথি। দাঁড়িয়ে রইল। আমার বন্দরের কাল শেষ হয়েছে, জল-কয়লা নেওয়া হয়ে গেছে। প্রভাতালোকিত শান্ত সমুদ্রের মত সম্মুখের প্রান্তর ঝলমল করছে। বেরিয়ে পড়লাম, পেছনে তাকাবার অবকাশ ছিল না এমন নয়, আসলে তাগিদ ছিল না। তবে মনে মনে কল্যাণ কামনা করেছিলাম। এবং ভেবেছিলাম, নতুন কালের ঋষিকুলের শ্রেষ্ঠ সভা রোটারী ক্লাবের পোশাকের খসখসানি এবং পেয়ালা পিরিচ ও গ্লাসের টুং-টাং শব্দের পটভূমিতে সভাপতির হাতুড়ির শব্দনিয়ন্ত্রিত সমাবেশের মধ্যে এদের সম্পর্কে একটি তত্ত্বমূলক বক্তৃতা দেব। জনহিতকামী অভিজাত গুণীবর্গকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিন্তান্বিত করে তুলব। তাতে এদেরও কিছু হবে এবং দেশের নৃতত্ত্ববিৎ এবং সভ্যতার ইতিহাস-সন্ধানীরাও কিছু খোরাক পাবেন। সঙ্গে অমল চৌধুরীও কিছু পাবে। কাগজে নাম, হয়তো বা ছবিও বেরিয়ে যাবে।

একটু বক্র হাসি অমল চৌধুরীর মার্জিত মুখের পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠল। তারপর আবার শুরু করলে, হঠাৎ—

অমল চৌধুরী যা বলতে যাচ্ছিল, সেই ছবি যেন চোখে দেখতে পেলে সে। একটা পরিবর্তন হয়ে গেল তার আকৃতিতে, কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিমায়—সমস্ত কিছুতে। সোজা হয়ে বসল সে। তার বসবার ভঙ্গীর মধ্যে যে বিদগ্ধসম্মত ঈষৎ আলসবিলাস ছিল, একটু ঘাড় বাঁকানো ভাব ছিল, সেটা অন্তর্হিত হল। কণ্ঠস্বরে অনাসক্তির যে ভানটা ছিল, তাও আর রইল না। কাঁপতে লাগল কণ্ঠস্বর, চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে

উঠল। সোজা হয়ে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রথমেই বললে, হঠাৎ আমি আক্রান্ত হলাম।

গ্রামটা পার হয়ে খানিকটা এসেই একটি পাহাড়িয়া জোড় বা কাঁদর অর্থাৎ ছোট নদী, সেই নদীর ঘাটের পাশেই একটা বড় পাথরের চাঁই, তারই আড়াল থেকে একজন দীর্ঘাকৃতি কালো মানুষ বেরিয়ে পড়ে অকস্মাৎ আমার পথ আগলে দাঁড়াল। একেবারে অতর্কিতে, অত্যন্ত অকস্মাৎ। মনে হল, ওই পাথরের চাঁইটা ফাটিয়েই সে বেরিয়ে এল!

আমি চমকে উঠলাম, থমকে দাঁড়ালাম। লম্বা লোকটার চোখে দেখলাম কুটিল আক্রোশ। সে আক্রোশ ক্রোধের অগ্নিশিখা স্পর্শে বারুদের মত বিস্ফোরণোন্মুখ।

চাপা হিংস্র গলায় সে 'আ' অথবা 'হা' ধরনের একটা শব্দ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দু পাটি বেরিয়ে পড়ল।

আমি বেল্টে হাত দিতে গেলাম। মুহূর্তে লোকটা হাত চেপে ধরলে, বললে, উখানে তুর গুলি আছে আমি জানি।

লোকটা অনেক জানে আমার সম্পর্কে, কিন্তু আমি স্মরণ করতে পারলাম না ওকে। আমি ভীরু নই। শুধু পিঠের ব্যাগের চামড়ার বাঁধনে একটু কাবু হয়ে পড়েছি। নিজেকে সংযত করে বললাম, কী চাও তুমি? টাকাকড়ি?

সে বললে, চিনতে পারছিস না? দাঁতগুলি তার আরও বেরিয়ে পড়ল। বলতে লাগল, আমি তুকে কাল সন্জেতে দেখেই চিনলম। এক নজরে চিনে নিলম। হ্যাঁ। সা-রা-রা-ত ঘুম হল না। মোড়লের ডরে বুঝাপড়াটা করতে লারলম। ভোরবেলাতে থেকে গাঁয়ের বাহিরে এসে বসে আছি। কুন্ পথে তু যাবি, চল্, কাঁদন যাবে, বুঝাপড়া করবে সে। হ্যাঁ। এইবারে কী হয় বল্? অঁা?

খুব যে ভয় পেয়েছিলাম তা নয়, তবে ভয় খানিকটা হওয়ার কথা, হয়েছিল। কিন্তু ভাবছিলাম, বোঝাপড়াটা কিসের ?

কাঁদন বললে, আখুনও চিনতে লারলি ? দেখ্ দেখি। তার লম্বা চুল সরিয়ে কপালের একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বললে, ই দাগটো মনে পড়ছে না তুর ? অঁা ? মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল তার।

এবার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। বিস্মৃতি একটা পর্দার মত সরে গেল।—চোখে অণ্ডাল রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ফুটে উঠল, প্ল্যাটফর্মের উপরে একজন লম্বা কালো জোয়ান একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে ছুটে চলে আসছে দেখলাম। পিছনে একদল ভদ্রবেশধারী তাকে অনুসরণ করছে। ধর্—ধর্।

ওই ডাণ্ডা-হাতে লোকটাই কাঁদন। আমি একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মেরে ওর কপালে ওই ক্ষতটা করে দিয়েছিলাম। আঘাতে অভিভূত হয়ে কাঁদন তার হাতের লোহার ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে 'বাপ' বলে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছিল। কাঁদন শহরে কলিয়ারিতে ঘুরে তার অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। থার্ড ক্লাস ওয়েটিং-রুমে সে একখানা বেঞ্চ দখল করে শুয়ে ছিল। টিকিট ছিল তার গেঁজলেতে ভরা। একজন বাঙালী ভদ্রলোক মেয়েছেলে নিয়ে ওয়েটিং-রুমে এসে বেঞ্চখানি দাবি করেছিলেন। বলেছিলেন, তুই উঠে মেঝেতে শুগে যা।

কাঁদন বলেছিল, তু যা ক্যানে, মাটিতে শুগা।

—আরে ! ব্যাটার ছেলের বাড় দেখ দেখি !

—গাল দিস না বলছি।

—আরে, গাল কি দিলাম !

—দিলি না? বুললি না, বেটার ছেলে? তু আমার বাবার বাবা নাকি?

অন্যায় ভদ্রলোকের হয়েছিল। এ পর্যন্ত আমরা ওদের পিতার মতই শাসন করেছি, মানুষ করতে চেষ্টা করেছি পিতৃত্ব দাবি করেছি। হঠাৎ পিতামহত্বের দাবিটা অন্যায় বইকি!

এই নিয়েই বিবাদ শুরু। কাঁদন ওই হলদে টিকিটের টুকরোটুকুর জোরে সমানে তর্ক করেছিল। সে একেবারে পাকা উকিলের মত তর্ক! ভদ্রলোকের পক্ষে জুটে গেলেন অনেক সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি; কাঁদনের পক্ষে দু-চারজন জোটে নি এমন নয়, কিন্তু নারী জাতির সম্মানের দাবিও সে যখন উপেক্ষা করলে তখন তারাও তার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করলে।

শায়িত কাঁদন উঠে বসে বলেছিল, বসুক, ওইখানে বসুক।

—তুই ওঠ, তবে তো বসবে।

—উঁহু। আমার পাশে বসুক। ওই ছোট মেয়েটা বসুক, তার উপাশে বসুক মাটো। আমি উঠব না। উঁহু।

তখনই যে কেন ব্যাপারটা চরম নাটকীয় মুহূর্তে পৌছয় নি, এইটেই বিস্ময়ের কথা। কিন্তু পৌছয় নি। পৃথিবীতে বিস্ময়ের কথা কিছু নয় বা নেই।

*

অগত্যাই ছোট মেয়েটিকে মাঝখানে রেখে বসেছিলেন মহিলাটি। ভদ্রলোক বসেন নি। কিছুক্ষণ চায়ের স্টলে বসে, কিছুক্ষণ পায়চারি করে রাত্রি কাটাচ্ছিলেন। রাত্রি অবশ্য তখন শেষ, বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে, কাক-কোকিল ডাকছে; কিন্তু যারা সারা রাত্রি জাগে তাদের ঘুমের ঘোরটা তখনই হয়ে উঠে প্রচণ্ড রকমে গাঢ়।

ওয়েটিংরুমের আলোটাও ঢুলছিল—দপদপ করছিল। কাঁদন বসেই ঘুমুচ্ছিল, ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে গিয়েছিল, ওই ন-বছরের মেয়েটির ওপর। ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়ায় নি, তিনি এসেই প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেছিলেন কাঁদনের গালে। বর্বর কাঁদন, উদ্ধত কাঁদন! মুহূর্তে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে প্রচণ্ডতর চপেটাঘাত করেছিল ভদ্রলোকের গালে। হৈ-হৈ উঠে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। শুরু হয়ে গিয়েছিল কাঁদন-শাসন-পর্ব, চারিদিক থেকে ছুটে এসেছিলেন ভদ্রলোকেরা। ইদানীং নীচের স্পর্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে—এ সম্পর্কে মতভেদ ছিল না। পড়েছিল কিল চড় ঘুষি।

কাঁদন প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল, দিয়েছিলও কিছু কিছু। কিন্তু এত লোকের সঙ্গে সে একা কতক্ষণ লড়বে? সে ছুটে পালিয়েছিল। কিন্তু তাতে নিষ্কৃতি হয় নি, আর্যেরা উদ্ধত অনার্যের অনুসরণ করে-ছিলেন। অবশ্যই প্রয়োজন আছে শাসনের। কাঁদন প্ল্যাটফর্মের ওপরে কুড়িয়ে পেয়েছিল ডাণ্ডাটা। রেলিং-ভাঙা লৌহখণ্ড অথবা এমনই কিছু। সেইটে হাতে তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে পালাচ্ছিল। বন্য মানুষেরা ভয় পেয়ে এইভাবেই পালায়। আমি বিপরীত দিক থেকে ঢুকেছিলাম প্ল্যাটফর্মে। লৌহদণ্ডধারী পলায়নপর একজন লম্বা কালো মানুষের পিছনে অনুসরণরত আর্যদের 'ধর ধর' শব্দ শুনে স্বভাবতই আমি ওকে ভেবেছিলাম, কোন অপরাধী—চোরের চেয়ে বড় রকমের অপরাধী। চোরের লোহার ডাণ্ডা ঘুরোবার মত সাহস অবশিষ্টথাকে না। বেল্টের পিস্তলটা সঙ্গেই থাকে। সেদিনও ছিল। কিন্তু ওটা বের করেও ছুঁড়ি নি। ওটাকে বাঁ হাতে ধরে একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে হাঁকও মেরেছিলাম—খবরদার। অব্যর্থ লক্ষ্য বলে আমার অহঙ্কার কোনদিন নেই। পিস্তলেও নেই।

ওটা রাখি শব্দ করে, হাঁক মেরে কাজ হাসিলের জন্যে। ঢেলা দিয়ে লক্ষ্যভেদ বাল্যকালের পর কোনদিন করি নি। কিন্তু সেই কাঁদনের ভাগ্যে ছিল দুর্ভোগ, আর তারই জের টেনে এতদিন পরে আমাকে ভুগতে হবে কঠিনতর দুর্ভোগ, তাই বোধ হয় পাথরের টুকরোটা সোজাই গিয়ে লেগেছিল কাঁদনের কপালে। কাঁদন দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু কম আঘাত পেত; দুই বিপরীতমুখী গতিবেগ আঘাতটাকে গুরুতর করে তুলেছিল। কাঁদনের মত জোয়ান, লোহার ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে 'বাপ' বলে বসে পড়েছিল। তারপর আর আমাকে কিছু করতে হয় নি। যা করবার করেছিল দলবদ্ধ জনতা। সে দেখে আমার অনুশোচনার আর সীমা ছিল না। ওকে রক্ষা করবার শক্তিও তখন আমার নেই। আমি ছুটে গেলাম জি. আর. পি.তে। সেখানে আমি ছিলাম চিহ্নিত ব্যক্তি। থানার হস্তক্ষেপে কাঁদন রক্ষা পেলে। সেখানেই শুনলাম, অবমানিতা ভদ্রকন্যাটির বয়স সবেমাত্র নয়। এবং অবমাননা, শুনলাম, নিদ্রার মধ্যে ঢলে পড়া। অনুশোচনার আর সীমা ছিল না আমার। ঘোর কৃষ্ণ ললাটে গাঢ় লাল রক্তের ধারা মাথা প্রহারে জর্জরিত দেহ কাঁদন উদাস দৃষ্টিতে থানার ছাদের দিকে চেয়ে ছিল; বোধ করি, দেখতে চেয়েছিল সে আকাশ। আকাশে দেবতা থাকেন। অথবা ওই নীলের মধ্যে হৃদয়স্পর্শী সান্ত্বনা আছে।

আমিই জি. আর. পি.কে বলেছিলাম ওকে হাসপাতালে পাঠাতে। ডাক্তারও আমার চেনা লোক। তাকে পত্র লিখে দিয়েছিলাম একটা সিরাম ইন্‌জেকশন দেবার জন্যে। বিশেষ যত্ন নিতেও অনুরোধ করেছিলাম। জানি এই আরণ্য মানুষদের সহনশক্তি অপরিমেয়। তবু আমি পণ্ডিত জন, নিজের মতই দেখতে চেয়েছিলাম

কাঁদনকে। যদি বল—পাণ্ডিত্যের প্রেরণায় নয়, ওই উদারতাটুকু অপরাধবোধের তাড়নাসম্ভূত, তাতে আপত্তি করব না। বলতে পার। হয় তো তাই সত্য।

*　　　*　　　*

কারণ কাঁদন—সেই লোক। অথচ আমি তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্ভবত ওই প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধই কাঁদনের স্মৃতির ওপর একটা আবরণ টেনে দিয়েছিল। কিন্তু ওই কপালের দাগটা দেখিয়ে ইঙ্গিত করা মাত্র সে আবরণটা সরে গেল। এক মুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল।

যে আঘাতে দেহই শুধু আহত হয় না, মর্মও আহত হয়—সে আঘাত মর্মান্তিক। সাংঘাতিক আঘাতে মানুষ মরে, তার স্মৃতির সেইখানেই সমাপ্তি হয়, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত মর্মান্তিক হলে তার বেদনা জন্মান্তরেও বহন করে নিয়ে চলে বলে প্রাচীন সাহিত্যে-পুরাণে নজির আছে। সেই আঘাতের প্রতিঘাতে জরা-ব্যাধের শরাঘাতে মহাভারতের নায়ক যদুপতি বিদ্ধ হয়েছিলেন। অবশ্য জন্মান্তর আজ প্রশ্নের কথা; সে আমি বৈজ্ঞানিক হয়ে বলছি না, তবে মর্মান্তিক আঘাত মানুষ জীবনে কখনও ভোলে না, ভুলতে পারে না।

কাঁদন আমার হাতখানা ধরে ছিল, তার মুঠি ক্রমশই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছিল, কালো লম্বা হাতের মোটা শিরাগুলি রক্তের চাপে আরও ফুলে উঠছিল; পেশীগুলি স্ফীত হচ্ছিল, চোখ দুটি যেন ধকধক করে জ্বলছিল অঙ্গারের মত, দাঁতে দাঁত ঘষছিল কাঁদন, নাকের ডগাটা ফুলছিল। কপালে ত্রিশূলচিহ্নের মত তিনটে শিরা দাঁড়িয়ে উঠেছে। এবার আমি সতর্ক হলাম, শঙ্কা অনুভব না করে পারলাম না। বর্বর-জীবনে স্নেহ যেমন গাঢ়, হিংসা তেমনই ভয়ঙ্কর।

নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে সংহত করে এবার আমি বললাম, হাতছাড়।

তখন আমার বৈদগ্ধ্যের খোলস খসে পড়েছে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও। কণ্ঠস্বর উত্তেজিত এবং উচ্চ হয়ে উঠেছে। আত্মরক্ষার প্রেরণার সঙ্গে অগ্নির সহচর বায়ুর মত হিংসা-প্রবৃত্তিও জেগেছে। কাঁদনের সম্মুখে আমি অন্যায়ের ভূমিতে দাঁড়িয়েও তাকে ন্যায্য শাস্তিদাতা ভাবতে পারছি না। ভাবছি, আমার শত্রু সে, তাকে আঘাত করবার অধিকার আমার আছে। কোন রকমে পিস্তলে হাত দিতে পারলে কাঁদনকে গুলি করতে দ্বিধা করব না। উচ্চ উত্তেজিত অথচ গম্ভীর কণ্ঠেই বললাম, হাত ছাড়।

কাঁদন চীৎকার করে উঠল, না।

দেশটা বিচিত্র। অরণ্য এবং টিলার পরিবেষ্টনের মধ্যে তার 'না' উচ্চ শব্দটি উচ্চতর শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। না! এমন প্রতিধ্বনি কদাচিৎ শোনা যায়। বোধ করি, যে স্থানটিতে আমরা দাঁড়িয়ে-ছিলাম, সেই স্থানটিই ছিল এমন প্রতিধ্বনি তোলবার কেন্দ্রবিন্দু।

তার পরই সে গম্ভীর ভয়ঙ্কর চাপা গলায় বললে, তুর মাথায় আমি পাথর মারব—এই পাথরটা।

একটা তীক্ষ্ণকোণ পাথর। ওজনে এক পাউণ্ডের বেশি। পাথরটা ছিল তার বাঁ হাতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিছনের সেই টিলার উপর থেকে একটা শঙ্কিত উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কাঁদন! ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর; কাঁদন চমকে উঠল।

মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, এ কণ্ঠস্বর গ্রামের মোড়লের।

আবার সেই ডাক ভেসে এল, কাঁদন!

প্রথম ডাকেই কাঁদন চমকে উঠেছিল। এবার সে আমার মুখ থেকে চোখ তুলে আমার পিছনের দিকে—তার সম্মুখের টিলার দিকে

তাকালে। এবং ঠিক এক ভাবেই সে তাকিয়ে রইল, যেন স্থির হয়ে গেছে। ভয়ে মুখে চোখে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন খেলে যাচ্ছিল। আগুনের অঙ্গারের ওপর ছাইয়ের আবরণ পড়া দেখেছ? ছাই পড়ে আসে, আবার বাতাসে ছাই উড়ে গিয়ে উজ্জ্বল প্রখর হয়ে ওঠে, আবার ছাই পড়ে; দেখছ? ঠিক সেই রকম। একটা সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব।

মোড়লই বটে।

ছুটে এল প্রৌঢ়। সে হাঁপাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিতে তার সে কি আতঙ্ক, আর তারই সঙ্গে ব্যক্তিত্বময় শাসনের সে কি ইঙ্গিত! সে ঠিক বোঝানো যায় না। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, হাত ছাড়্। অতিথের হাত ছাড়্।

উদ্যত আক্রোশ অকস্মাৎ যখন নিরুপায় হয়ে পড়ে, তখন তার অবস্থা হয় বিষদাঁত-ভাঙা সাপের মত। যন্ত্রণায় ক্ষোভে সে গর্জায়, কিন্তু সে যেন কান্না, উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস!

তেমনিভাবেই কাঁদন বললে, না। আমি ছাড়ব না। না।

—ছাড়্। মোড়ল বললে, হু—ই পাথরটোর দিকে তাকা।

চমকে উঠল কাঁদন।

মোড়ল তাদের নিজের ভাষায় বললে—সে যেন মন্ত্র পাঠ করলে—হুই সাদা পাথরটোর দিকে তাকা। তাকিয়ে থাক্। সাদা পাথরটো কালো হয়ে যেছে, আকাশের নীলবরণ এইবারে তামার বরণ হয়ে উঠবেক; বাতাসে উঠবেক মড়া-পোড়ানোর গন্ধ; নদীর জলে পোকা হবেক, থিকথিক করবেক; হুই চারি পাশের বনে গাছগুলার পাতায় ফুলে শুঁয়াপোকা লাগবেক; পাখিগুলান ডাকবেক শকুনের ডাক; বাঁশের বাঁশী বোবা হয়ে যাবেক; তারপর সুরুয-ঠাকুরের সোনার বরণ হয়ে যাবে সীসার মতন, আঁ-ধা-র হয়ে যাবে। পৃথিবী—আঁ-ধা-র—

কাঁদন চিৎকার করে উঠল, না না। বলিস না, আর বলিস না, আর বলিস না।

আমার হাত ছেড়ে দিল সে। শুধু তাই নয়, দেখলাম, অকস্মাৎ আগুন নিবে গিয়ে সে যেন অঙ্গারের মত স্তিমিত হয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টি শূন্য, হয় খুঁজতে চাইছে দেবতাকে অথবা তার লুটিয়ে পড়া আক্রোশকে। কিন্তু সে নিজেই পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কারুর দিকেই পঙ্গু দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারছে না!

মোড়ল বললে, লে, এইবার অতিথের হাত ধরে বল্—

কাঁদন নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল, কি বলতে হবে সে জানত, বললে, আমার মনের পাপ তোমার চরণে দিলাম, তুমি চরণ দিয়ে তাকে মার, আমাকে মুক্তি দাও। আমার বাড়ি চল, আমার মনের মধু তুমি লাও।

মোড়ল আমাকে বললে, ই দিনটি তোমাকে থাকতে হবেক অতিথ, কাঁদনের ঘরে ক্ষীর আর মধুর পায়েস খেতে হবেক। না খেলে কাঁদনের নরক হবেক। গোটা গায়ের সর্বনাশ হঁবেক। ওই পাহাড়ের মাথায় ওই যে সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবেক। ওই পাথর কালো হলে আকাশের নীল বরণ তামার বরণ হয়ে উঠবেক। তার পরে বাতাসে উঠবেক মড়া-পোড়ানোর গন্ধ।

বলতে লাগল মন্ত্রের মত সুরে—সেই পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসের সেই বিচিত্র অবিশ্বাস্য কথাগুলি। কিন্তু আমার কাছে অবিশ্বাস্য হলেও তাদের বিশ্বাসের গাঢ়তায় মোড়লের কণ্ঠস্বরে যে আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে দিক্‌দিগন্তর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

—নদীর জলে পোকা হবেক, থিকথিক করবেক; দুই চারি-

পাশের বনে গাছগুলার পাতায় ফুলে শুঁয়াপোকা লাগবেক ; পাখি-গুলান ডাকবে শকুনের ডাক ; বাঁশের বাঁশি বোবা হবেক ; তার পরে সুরুর্য-ঠাকুরের সোনার বরণ—

স্বর্ণদীপ্তি জ্যোতির্ময় সবিতা দেবতা পরিণত হবেন নির্বাপিতদীপ্তি মসীময় সীসকপিণ্ডে।

একটা উদ্বেগ আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেললে, আমার সচেতন মনের চেতনাও যেন অবলুপ্ত হয়ে আসছিল। আমি বললাম, চল। আমি যাচ্ছি।

দুই

বিচিত্র পদ্ধতি।

আজ জগতে আর্য-অনার্য ভেদটা উঠে গেলেও মুখে না মানলেও ওদের আমাদের বিচারধারাটা স্বতন্ত্র হয়েই রয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, সংস্কারাচ্ছন্ন আর সংস্কারমুক্ত, বিশ্বাসবাদী আর বুদ্ধিবাদী, যা বলা যাক, দুটি স্তরভেদে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমার বুদ্ধি-বাদী মন সেদিন আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই ওদের বিচার কিন্তু বিশ্লেষণ করি নি, অবাক হয়ে পদ্ধতির বিচিত্র মাধুর্য শুধু দেখে গিয়েছিলাম।

কাঁদনের বাড়ির সমস্ত দুধটুকু জ্বাল দিয়ে ক্ষীরে পরিণত করে, বন থেকে মধু সংগ্রহ করে এনে পায়স তৈরি করে আমাকে খেতে দিলে।

শান্তশ্রী কৃষ্ণাঙ্গী একটি তরুণী। কাঁদনের স্ত্রী—মোড়লের কন্যা। আয়ত চোখ, শুভ্র দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে সেদিন বিষণ্ন মিনতি মিশে একটি অপরূপ মাধুরীর সৃষ্টি করেছিল।

কাঁদন সামনেই বসে ছিল। স্তব্ধ হয়ে বসেই ছিল সে, যা করণীয় সে-সবই করলে ওই শুচিস্মিতা মেয়েটি। আমার সম্মুখে আহার্যের

পাত্র নামিয়ে দিয়ে, সে স্বামীর পাশে গিয়ে বসল। হাতজোড় করে বললে, অতিথ, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের মনের মধু এবং ক্ষীরে পরিতৃপ্ত হও। আমাদের মনের জ্বলন তাতেই দূর হোক।

কাঁদনও কথাগুলি বলছিল তার সঙ্গে, কিন্তু থেমে থেমে। ঠোঁট তার কাঁপছিল। উচ্চারণ যেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। বার বার মেয়েটি স্বামীর দিকে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছিল। মোড়লও দৃষ্টিতে শাসন পরিস্ফুট করে চেয়ে ছিল কাঁদনের দিকে।

আমি বুঝলাম, কাঁদন ক্ষোভকে জয় করতে পারে নি। অথবা প্রাচীন সংস্কারের কাছে সে নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারছে না।

তবু আমি বললাম, আমি প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ করছি।

মধু এবং ক্ষীর পরিতোষের সামগ্রী, পরিতোষসহকারে পান করলাম। না করলে ওদের সর্বনাশ হবে, কাঁদনের নরক হবে, গ্রামের সর্বনাশ হবে ; ওই পাহাড়ের মাথায় সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে ; পাথরখানি কালো হলে আকাশের সুনীল-সুষমা কঠিন তাম্রবর্ণে রূপান্তরিত হবে ; বাতাস শবগন্ধে পরিপূর্ণ হবে, এমন কি সূর্যদীপ্তিও নিভে যাবে।

ধীরে ধীরে আমার বুদ্ধি চেতনা লাভ করলে।

প্রশ্ন করলাম, অর্থ ?

অর্থ তারা জানে না। তারা জানে, দেবতাকে যে জেনেছিল, যাকে ঘিরে তারা ওই গ্রাম রচনা করেছিল, এ হল তারই আদেশ। সেই মানুষটিই ওই পাহাড়ের উপর ওই সাদা পাথরখানি স্থাপন করে গিয়েছে।

মোড়ল বললে, সে শুধু পাথরখানিই রেখে যায় নাই অতিথ। ওই পাথরের উপরে দেবতাকেও বসিয়ে দিয়েছিল। সে দেবতা একদিন

চলে গেল। কারা এসেছিল সব, তারা কাঠের মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিলে, পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল। সে দেবতা আর কেউ গড়তে লারলে। ওই দেখ—

দেখালে সে সেই চালা-ঘরের খড়দল। খড়দলের গায়ে জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে সারি সারি মুখ। রাত্রের অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাই নি, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম এক মুখ। ধ্যানমগ্ন মানুষের শান্ত মুখ, কিন্তু মূর্তির মধ্যে কিছু যেন অস্পষ্ট রয়েছে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি বা কালের জীর্ণতায় অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মোড়ল বললে, সে মুখ হয় না! দেবতাকে না জানলে হয় না। মনের হিংসা দেবতার পায়ে না দিতে পারলে হবেক ক্যানে?

আমরা মাটির পুতুল গড়ি, কাঠের কাজ করি, নক্‌শা আঁকি, কিন্তু দেবতাকে তো আমরা জানি না।

বলতে ইচ্ছা হল, দেবতা নাই। কিন্তু জিভে বেধে গেল।

মোড়ল বললে, দেবতার আদেশ্ আছে—এই গাঁয়ের লোকে যদি অতিথিকে হিংসে করে, তার উপরে রাগ করে, তবে এমনি করে তার পায়ে হিংসে-রাগ ঢেলে দিয়ে মধু আর ক্ষীরের পায়েস রেঁধে খাওয়াতে হবে। তার কাছে হাতজোড় করতে হবে। নইলে ওই সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে! পাথর কালো হয়ে গেলে আকাশের নীল বরণ তামার বরণ হয়ে যাবেক—

সেই বিচিত্র বিশ্বাসের কথাগুলি সে আবার বলে গেল, মন্ত্রোচ্চারণ মত। শেষে বললে, ওই পাথর আর বেশিদিন সাদা থাকবে না অতিথ। এই কাঁদনের মতন মানুষগুলান এখন বেশি জনম লিছে। এই দিন ওই দিনমণি সব সী-সার মত হয়ে যাবেক।

কাঁদন অকস্মাৎ উঠল, উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

শুচিস্মিতা মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল, বললে, অতিথ, আমি যাই।

*   *   *

পথের পাশেই পড়ে ওদের সেই পাহাড়টি। গ্রামের ঠিক পরেই। পাহাড় নয়, একটা বড়গোছের পাথরবহুল টিলা। পূর্বেই বলেছি, কোনও দূর অতীতে কোনও ভূমিকম্পে এখানকার মাটির নীচের পাথরের স্তরটা উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে মাথা ঠেলে উঠেছিল। কালো মরা পাথরের স্তূপটার সর্বোচ্চ স্থানটিতে ওই সাদা পাথরখানি রক্ষিত। একখানি আসন। আশ্চর্য সাদা পাথর। এই ধরনের পাথর—তবে সে পাথর নরম এবং আরও কম সাদা—উড়িষ্যার খণ্ডগিরি-উদয়গিরি অঞ্চলে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সে নয়। এ পাথর শক্ত এবং রঙ আরও সাদা। কোথাও একটু মালিন্য নেই। গ্রামের লোকের সযত্নমার্জনায় এতটুকু কলঙ্করেখা পড়তে পায় না, বর্ষার বৃষ্টিতে শ্যাওলা পর্যন্ত ধরে না। মার্জনায় মার্জনায় হাতের স্পর্শে একটি চিক্কণতা ফুটে উঠেছে পালিশের মত। পাহাড়ের মাথায় পরিসরতা দেখে বোঝা যায় যে, এককালে এখানে মন্দিরের মত কিছু ছিল। এখন আছে একটি চত্বর—তার উপরে উঁচু বেদী, তার উপরে ওই আসনখানি স্থাপিত। কালো পাথরের স্তূপের উপর সাদা পাথরখানি একটি শোভার সৃষ্টি করেছে। এর বেশী দ্রষ্টব্য আর কিছু নেই। হতাশ হয়ে নেমে আসব, দেখলাম, একজন ব্রাহ্মণ উঠে আসছে।

নগ্নগাত্র ব্যক্তিটির উপবীতটি বেশ মোটা এবং সদ্য-পরিষ্কৃত। টিয়াপাখির মত নাক—শুকনাসা, শীর্ণকায়, তামাটে রঙ, লম্বাটে মুখ, ছোট কেশবিরল মাথাটিতে ফুল-বাঁধা একটি টিকি, বিচিত্র গোল চোখ। ব্রাহ্মণ যে ধূর্ত, তাতে আমার সন্দেহ রইল না। হাতে একটি সাজিও দেখলাম। বুঝলাম, পূজো করতে আসছে।

আমাকে দেখেই ব্রাহ্মণ থমকে দাঁড়াল। গোল চোখ দুটি বহু ভাবনায় ও অনুমানে জ্বলজ্বল করে উঠল। কিন্তু বোধ হয় কোনো অনুমানে উপনীত হতে না পেরেই সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আপুনি?

বললাম, দেখতে এসেছি।

—দেখিতে আসিছেন? কয়লার জায়গা? তা কয়লা ঠাঁইটির নীচে আছে। এই পাহাড়টি আমার সীমানা। কয়লা ইয়ার তলা পর্যন্ত আছে। উ-পাশেও আছে, তা এমুন ডাইক লেগেছে যে, উখানে কাজ করা আর টাকা জলে ফেলা একই কথা। উ ঠাঁইগুলান ওই গেরাম-বাসীর নিষ্কর বটে। স্বত্ব উয়াদের। ই পাহাড়টি আমার। নিবেদন?

আমি হেসে বললাম, না, কয়লার জায়গা দেখতে আমি আসি নি। আমি এই দেবস্থান দেখতে এসেছি।

—দেবোস্থান দেখিতে আসিছেন! বিস্ময় অনুভব করলে সে। তার পরই সে অকস্মাৎ মুখর হয়ে উঠল—মহাপুণ্যস্থান আজ্ঞা। শহর লয়, ঘাট লয়, এই নিজ্জনে মহাপুরুষের সাধনপীঠ। ওই আসনখানি ছুঁয়ে আপুনি যা মানস করবেন, সিদ্ধ হবে। হুই দেখেন, হুই বনের উ-পাশে কালো মেঘের মত দেখিতে পাবেন পরেশনাথ পাহাড়—সমেতশিখর পুণ্যভূমি, ওই স্থানের উপপীঠ। মনের কালিমা কেটে যায়, অক্ষয় মুক্তি হয়, মনের বাসনা পূর্ণ হয়—

বাধা দিলাম। বললাম, ঠাকুর, মনে কালি আমার যা আছে, সে তোমার ওই কয়লার সিমের মতো। মুছলে যায় না। পোড়ালে ছাই হয়। মুক্তি আমি চাই না। মনের বাসনা আছে, প্রণাম করেও তা পূর্ণ হবে না। তবে, এ কি ঠাকুর, কোন দেবতার স্থান, কি কাহিনী, বলতে যদি পার, তবে তোমাকে কিছু দেব আমি।

—হুঁ, আজ্ঞা। বলব আজ্ঞা। এই পূজাটি আমি সেরে লিই।

তিন মিনিট, রাম—দুই—তিন। বলেই সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ফুল ফেলতে লাগল। সাজিতেই ছিল একটি ঘটিতে জল। তাও ঢেলে দিলে খানিকটা। ঢিপ করে একটি প্রণাম করে উঠেই বললে, ইখানেই বসবেন বাবু?

—হ্যাঁ। বস।

সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম আমি।

পাশে বসল ব্রাহ্মণ। বললে, দুটা টাকা কিন্তু গরিব বামুনকে দিবেন।

* * *

বক্তা বৈজ্ঞানিক সৌতির চোখে আবার স্বপ্নের ঘোর নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, আশ্চর্য হে! দীন ধূর্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল আর একজন মানুষ। সে-ই এ দেশের কথক —বলে গেল চমৎকার ভাষায়। সুন্দর কথকতা।

"পঞ্চ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জৈনধর্ম। সদ্ধর্মেরও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সত্যযুগে আদিনাথ ঋষভদেব সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে মহাতপস্যায় জিনত্ব অর্জন করে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্যই ধর্ম, সত্য ছাড়া মিথ্যা কথনে, চিন্তনে, কল্পনায় আত্মার পতন হয়। এই ধর্মের ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। ওই সমেতশিখর আনন্দধামে ভগবান পার্শ্বনাথ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন? মহাপুণ্যভূমি ওই সমেতশিখর। ওখানকার মৃত্তিকা স্পর্শে মানুষ সদভাবনায় ভাবিত হয়, সিদ্ধির পথে খানিকটা অগ্রসর হয়। ওই সমেতশিখরে ভগবান পার্শ্বনাথের যে প্রথম পূজাপীঠ নির্মিত হয়, তাই যিনি নির্মাণ করেছিলেন, মহাশিল্পী তিনি ছিলেন সাধক সন্ন্যাসী। তাঁর এক শিষ্য ছিল এই স্থান তাঁরই সাধনপীঠ। রাজকুলে তাঁর জন্ম। যে মুহূর্তে

তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই মুহূর্তে—মুহূর্তের জন্য তাঁর কপালে সকলে প্রত্যক্ষ করেছিল, চন্দ্রকলার শোভা। কালো ছেলে—কপালে বাঁকা চন্দ্রকলা ভ্রম হয়নি। মুহূর্ত পরেই মিলিয়ে গিয়েছিল। রানী প্রসব করেই গতাসু হলেন। সেদিন নাকি সমেতশিখরে একটি শঙ্খধ্বনি হয়েছিল। লোকে বলে, ভক্তের আবির্ভাবে পার্শ্বনাথ পুলকিত হয়েছিলেন।

এই যে অরণ্যভূম—এর নাম আজও পঞ্চকূট—এর মধ্যে চিরদিন বাস করে এই কৃষ্ণবর্ণ মানুষেরা। বিক্রমশালী সরল। চারিদিকে দিক-হস্তীর মত পর্বতবেষ্টনী, তার পাদদেশে ভীমকান্ত অরণ্য-শোভা; বুক চিরে বয়ে গিয়েছে দামোদর-বরাকর নদ; অরণ্যের ভিতরে শার্দুলেরা বিচরণ করে অমিতবিক্রমে। এরই মধ্যে বসবাস করত এই বীর্যবান জাতি। তাদেরই যিনি রাজা তাঁরই ঘরে জন্মালেন এই কুমার। রাণী মারা গেলেন। বিষণ্ণ রাজা মাতৃহারা সদ্যোজাত শিশুটি তুলে দিলেন ধাত্রীর হাতে। এর কিছুকাল আগেই এই রাজ্যে এসেছিল একজন বিদেশী। লোকটি বিদেশী কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন, তাতে সন্দেহ নাই। নিজের যোগ্যতা সে প্রমাণিত করেছিল।

ব্রাহ্মণ বললে, বাবু মশায়, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয়ই দিতে নাই, প্রশ্রয় তো দূরের কথা। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু রাজা গুণগ্রাহিতার আতিশয্যে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করেছিলেন। তাকে এক পদ থেকে উচ্চ পদে, সে পদ থেকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজার যখন পত্নীবিয়োগ হল, তখন ঐ বিদেশীই প্রায় সর্বেসর্বা। বৃদ্ধ বিশ্বস্ত মন্ত্রী দেখলেন, সুকৌশলে ওই বিদেশী তাঁর কল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। এমন যুক্তি ও বিনয়ের সঙ্গে তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে নিজের মনোমত কাজ করে যে, তাকে বলাও কিছু যায় না; উপরন্তু রাজা থেকে অন্য সকলের সমর্থন লাভ করে।

মন্ত্রী বিপদ গণনা করলেন, রাজাকে সতর্ক করেও ফল হয় না, সুতরাং তিনি সবিনয়ে অবসর নিলেন। বাকি সময়টা ইষ্টচিন্তায় কাটিয়ে দেবেন। কাজেই মন্ত্রী হল ওই বিদেশী।

এর পর ?

যা হবার তাই হল। ওই বিদেশী একদিন রাজাকে হত্যা করে রাজ-পদ গ্রহণ করলে। রাজ্যের মানুষ তখন উন্মত্ত। রাজকর সংগ্রহের অজু-হাতে সে তখন মধুকে মাধ্বীতে পরিণত করেছে; তণ্ডুল পচন-পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে সুরায়। পুরুষেরা হতচেতন, নারীরা হয়েছে নটী।

বাবু, তখন এ দেশে নারীরা প্রত্যেকেই নৃত্যপটীয়সী ছিল। এই যে বনভূমি, এর মাথার উপরে যখন বর্ষায় ঘন কৃষ্ণ মেঘ নেমে আসত, তখন ওই শাল-অরণ্যে গাঢ় সবুজ পল্লবশীর্ষে সহস্র ইন্দ্রধনু ফুটে উঠত। বাবু, গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘঃ; ওই ঘনঘটাবিস্তৃত মেঘমালা আকাশ-পথে চলত, গাছের মাথায় মাথায় কলাপীরা কলাপ বিস্তার করে নৃত্য করে কেকারব তুলে তাকে সম্বর্ধনা করত। রাজার অন্তঃপুর থেকে দরিদ্রের কুটীর-অঙ্গন পর্যন্ত কুলাঙ্গনারা রঙিন কাপড় পরে মাথার খোঁপায় গুচ্ছ গুচ্ছ গিরিমল্লিকা অর্থাৎ কুরচি ফুলের স্তবক পরে নৃত্য শিক্ষা করত। নাচত। বাবু, এখনও এরা বর্ষায় নাচে আর গান গায়—

এস মেঘ বস মেঘ আমার ভুয়ের শিয়রে
গলে নাম ভিজায়ে হে
টিলা থানা টিকরে
তোমার বরণ আমার কেশে—
যতন করে মাখি হে।

এই নৃত্যপরা কুলাঙ্গনারা তখন নর্তকীতে পরিণত হয়েছে। যেন

দামোদরে পাহাড়-ভাঙা বন্যার মত উল্লাস-উচ্ছ্বাসের ঢল নেমেছে। হায়! গিরিচূড়ায় বজ্রাঘাত হয়; কিন্তু কুলডাঙা গিরিকন্যা নদীর তা দেখবার অবকাশ কোথায়? রাজা নিহত হলেন। নূতন মন্ত্রী চলল রাজপুত্রের সন্ধানে! বীজ রাখবে না। কিন্তু রক্ষা করলে তাকে ধাত্রী। সে তাকে বুকে করে ছুটে এল সেই বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে। বৃদ্ধ মন্ত্রী গভীর অন্ধকারে ছেলেটিকে বুকে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

এই পাহাড়ে বাস করতেন ওই সিদ্ধ শিল্পী। তিনি হলেন বিশ্বকর্মা। প্রভু পার্শ্বনাথের মন্দির-মূর্তি নির্মাণের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন স্বর্গলোক থেকে। তিনি প্রভু পার্শ্বনাথের মূর্তি ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করবার জন্য সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যা করছিলেন। বৃদ্ধ এইখানে আশ্রয় নিয়ে ছেলেটিকে ওই সাধকের হাতে সমর্পণ করে সেই রাত্রেই চোখ বুজলেন।

সন্ন্যাসীবেশী বিশ্বকর্মার হাতে এই শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। সন্ন্যাসী তপস্যা করতেন, চুপ করে বসে শিশু দেখত। তিনি স্তবগান করতেন সে শুনত। অহিংসা অক্রোধ সত্য পরমোধর্ম! এরপর সন্ন্যাসী গেলেন সমেতশিখরে—প্রভু পার্শ্বনাথের মন্দিরপাদপদ্ম নির্মাণের জন্য, তীর্থঙ্করদের বিগ্রহ নির্মাণের জন্য। শিশু তখন বালক, সেও সঙ্গে গেল। বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন, সে নিরীক্ষণ করে। নিরীক্ষণ মাত্রেই সে আয়ত্ত করে শিল্পকৌশল।

নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হল, বিশ্বকর্মা স্বস্থানে প্রয়াণ করবেন, ছেলেটিকে তিনি ডাকলেন। ছেলেটি তখন যুবক। সর্বাগ্রে বললেন—তাঁর জন্মকথা, তাঁর পরিচয়। শুনেই ছেলেটির চিত্ত মহাবিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ইচ্ছা হল, ছুটে গিয়ে তার সর্বাপেক্ষা সূচীমুখ তীক্ষ্ণধার খোদাইয়ের অস্ত্রটা দিয়ে ওই রাজার বুক বিদ্ধ করে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তযন্ত্রণায় অধীর হয়ে চিৎকার করে উঠল সে।

আরও ঘটনা ঘটল।

ছেলেটি স্পর্শ করেছিল এই সাদা পাথরখানি; ওইখানি বেঁচেছিল—ওই মন্দির নির্মাণের পর। ছেলেটির ইচ্ছা ছিল, ওই পাথরে সে একখানি মনোরম আসন তৈরি করবে এবং তার উপর তার ইষ্টদেবতার মূর্তি নির্মাণ করে স্থাপন করবে। দীক্ষা তখন তার হয়ে গিয়েছে।এই সমেতশিখরে এসে স্বপ্নে সে দেখেছে এক মনোহর জ্যোতির্ময় পুরুষকে। নিত্য রাত্রে সেই পুরুষ এসে তার সামনে দাঁড়াতেন।

এই মুহূর্তে আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। দেহে-মস্তিষ্কে সে গভীর যন্ত্রণায় অধীর হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওই যে সাদা পাথরখানি, সেখানিও যেন আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠল এবং দগ্ধ বস্তুর মত অঙ্গারবর্ণধারণ করলে। কালো হয়ে গেল। ছেলেটির মনে হল, আকাশের সুনীল স্নিগ্ধ সুষমা বিলুপ্ত হয়ে গেল, তাম্রবর্ণে কঠিন হয়ে উঠল আকাশ। শ্বাস নিতে কষ্ট হল তার—শবদাহের গন্ধে বাতাস ভারী এবং কটু হয়ে উঠল! সমেতশিখর থেকে প্রবাহিত একটি স্বচ্ছতোয়া ঝরণা পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তার জল বিবর্ণ হয়ে গেল, লক্ষ কোটি কৃমি-কীটে সে ধারা বিষাক্ত হয়ে উঠল। পর্বতের সানুদেশে সবুজ কোমল পত্র-পুষ্পভরা অরণ্য-শোভা ঝরে গেল। দেখতে পেলে—কোটি কোটি কীটে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে অরণ্য। পাখিরা ডেকে উঠল শকুনের ডাক। তার হাতের বাঁশিটা ফেটে গেল। আকাশের সূর্য, তার জ্যোতি স্তিমিত হয়ে আসছে মনে হল—জ্যোতির্ময় সূর্য যেন গলিত সীসকপিণ্ডে পরিণত হতে চলেছেন।

চিৎকার করে উঠল সে। মনে মনে সে স্বপ্নদৃষ্ট দেবতাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কোথায় তিনি? দেখলে, এক ভয়াল মূর্তি

—রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষু, তীক্ষনখর ক্রূর দুটি শ্বাদন্ত, প্রকট করে সে দাঁড়িয়ে আছে।

—রক্ষা কর! বলে সে গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

—রক্ষা করবার শক্তি আমার নেই। তুমি তোমার ইষ্টদেবতাকে ডাক, যাকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ।

—তাঁকে যে আমি স্মরণ করতে পারছি না। কল্পনা করতে পারছি না। দেখছি এক ভয়াল মূর্তি।

—সে হিংসা। সিংহাসনে বসলে ওকেই তোমাকে স্থান দিতে হবে তোমার দক্ষিণে। কোষে ঝুলবে অসি। সেই অসি যে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করবে, সেই দক্ষিণ বাহুকে সে আশ্রয় করবে। তাকে বিদায় কর।

—কি করে করব? সে যে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্মুখে।

—তপস্যা কর।

—কোন মন্ত্র জপ করব? তুমি বলে দাও।

বিশ্বকর্মা তার হাতে তুলে দিলেন খানিকটা মাটি আর এক টুকরো কাঠ। বললেন, পাথরে কাজ করা সময়সাপেক্ষ। তুমি এই দিয়ে নিত্য একটি করে মূর্তি গঠন করবে। আর ভুলতে চেষ্টা করবে তোমার অন্তরের হিংসাকে। প্রথম তোমার মূর্তিগুলি ওই ভয়াল রূপই গ্রহণ করবে। দিনে দিনে দেখবে পরিবর্তন হচ্ছে। তার রূপ পরিবর্তিত হবে, আর এই যে পাথরখানি—এর এই অঙ্গারবর্ণ ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকবে। তারপর যেদিন তোমার সিদ্ধিলাভ হবে, হিংসা চিরদিনের মত বিদায় নেবে অন্তর থেকে, সেই দিন—সেই দিন দেখবে, এই পাথরখানি আবার নিষ্কলঙ্ক শুভ্ররূপ ফিরে পেয়েছে। সেই দিন দেবতাকে স্থাপন করবে এই আসনের উপর। তুমি ফিরে যাও সেই

পাহাড়ের উপর। প্রভু পার্শ্বনাথের এই সমেতশিখর—এ হল আনন্দধাম ; এখানে এখন থাকবার তোমার আর অধিকার নেই।

এই সেই পাহাড় বাবু। এখানে আরম্ভ হল এই অভিনব বিচিত্র সাধনা। মন্ত্র নাই, শুধু কাঠের উপর বাটালি হাতুড়ির সাহায্যে মূর্তির পর মূর্তি গঠন। কোনোদিন মাটি নিয়ে মূর্তি গঠন। প্রথম মূর্তি হল ভয়ঙ্কর, ওর অন্তরের সেই হিংসার মতো।

মুখের পর মুখ, মূর্তির পর মূর্তি। পাশাপাশি সাজিয়ে রাখেন। দেখেন।

নিত্য প্রভাতে উঠে প্রথমেই দেখেন এই শিলাসনখানি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টির পর্যবেক্ষণে শিল্পী দেখলেন, হ্যাঁ পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এই যে গ্রাম, এই গ্রামের অধিবাসীরাও এই দেশের মানুষ ; ওই রাজকুমারের স্বজাতি, তারাই এসে দিয়ে যেত তাঁকে আহার্য। আর সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখত—এই পাগল শিল্পীর কম।

ক্রমে সেই ভয়াল মূর্তির চিহ্ন আর রইল না। সহজ সুন্দর মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল তাঁর শিল্পের মধ্যে। এদিকে শিলাসনও সাদায় মিশ্রিত ধূসরবর্ণে রূপান্তরিত হল।

সেই দিনই বিচিত্র সংঘটন ঘটল আবার। মূর্তিটি শেষ করে তিনি স্মিতদৃষ্টিতে সেই মূর্তিটিকে দেখলেন। সে যেন একটি রূপবান কুমারের মূর্তি! ঠিক এই সময় এই পাহাড়ের পাদমূলে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। একজন রাজদূত এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, এই দেশের রাজা তাঁকে স্মরণ করেছেন। তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যের কথা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। রাজপুত্রের মূর্তি গড়তে হবে তাঁকে।

শিল্পী মুখ তুললেন না, বললেন, না। আমি যাব না।

—তিনি আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

—না—না—না। উষ্ণ হয়ে উঠলেন শিল্পী।

পর-মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে সবিনয়ে বললেন, আমার সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, আমি যাব না।

দূত চলে গেলেন। শিল্পী তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে মনে পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন যেন। ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি দূতকে। সেই রাজার দূত!

পরদিন প্রভাতে এই শিলাসনের কাছে এসে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। এ কি হল? ধূসরবর্ণে কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রণ যেন গাঢ় হয়ে উঠেছে! এ কি হল? কেন হল?

তাড়াতাড়ি তিনি মাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে বসলেন।

এ কি? মূর্তির মধ্যে আবার যেন সেই ক্রূরতার আভাস দেখা দিয়েছে!

আকাশের দিকে তাকালেন। ঈষৎ তাম্রাভা যেন সঞ্চারিত হচ্ছে সেখানে। বাতাস আবার যেন ভারী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, দূর নদীতীরে কোথাও যেন জ্বলেছে একটি চিতা।

হে দেবতা! হে গুরু! এ কি হল? এ কি হল?

রক্ষা কর! হে দেবতা, রক্ষা কর!

আবার অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। আবার এল এক রাজপুরুষ।

—না—না—না। তোমাদের আমি করজোড়ে বলছি, আমাকে নিষ্কৃতি দাও। সাধনায় বিঘ্ন করো না। আমি যাব না। আমি যাব না।

চলে গেল দূত।

শিল্পী আশ্বস্ত হলেন। আঃ, তিনি সঙ্কল্পভ্রষ্ট হন নাই।

আবার তিনি মূর্তি গড়তে লাগলেন। এবার মূর্তি হল আরও ভয়াবহ। শিলাসন আরও কালো হয়ে উঠল।

হে ভগবান! তবে? তবে কি—?

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করলেন।

প্রভাতে উঠেই শুনলেন, বনভূমিতে কেউ যেন কাঁদছে। মনে হল, পৃথিবী কাঁদছে। পরক্ষণেই মনে হল, না, তাঁর অন্তর কাঁদছে,—সেই কান্না ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে। প্রতিধ্বনি উঠছে। না, তাও তো নয়। এ কান্না যে কোন মানবীর বক্ষবিদীর্ণ-করা শোক-বিলাপ। কে? কে কাঁদছে?

কান্না এগিয়ে আসছিল।

এল। মূর্তিমতী শোকের মতো একটি মধ্যবয়সী মেয়ে! কোনোও মা।

—কে মা তুমি? শিল্পী প্রশ্ন করলেন, চোখে তাঁর জল এল।

—আমি? শিল্পী, তুমি দয়া কর, আমার পুত্রের—। বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন,বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন তিনি। তার পর ছুটে গিয়ে দু হাতে টেনে বুকে তুলে নিলেন সেই দারু-মূর্তিটি। যে মূর্তিটির গঠনশেষে শিলাসনের ধূসরবর্ণে ফুটেছিল শুভ্র-বর্ণের বেশি আভাস, যে মূর্তিটির মুখ দেখে শিল্পী মুগ্ধ হয়েছিল; এক কিশোর কুমারের মুখ ফুটেছিল যে মূর্তিটির মধ্যে।

—এই তো! এই তো আমার কুমার!

ইনি সেই রাজার রানী। রাজার ছেলে মুমূর্ষু। তিনি রোগশয্যায় থাকতেই রাজা মৃত্যু আশঙ্কা করে শিল্পীকে ডেকেছিলেন, ছেলের একটি মূর্তি গড়িয়ে নেবেন। শিল্পী যান নি। প্রত্যাখ্যান করে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। আজ রানী ছুটে এসেছেন।

কুমারের মূর্তি তুমি গড়ে দাও শিল্পী। কুমারশূন্য গৃহে আমি থাকব কি করে?

কিন্তু হে শিল্পী, তুমি কি সর্বজ্ঞ? তুমি কি দেবতা? আমার কুমারের মূর্তি—সুস্থ সুন্দর কুমারের মূর্তি তুমি গড়ে রেখেছ পুত্র-শোকাতুরার জন্য? আমাকে দাও। কি নেবে তুমি বল?

শিল্পীর মনে হল, আকাশ অমৃতময় হয়ে উঠেছে, বাতাসে মধুগন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে, পাখির গানে গানে—বাঁশির সুর ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্‌দিগন্তে। পুষ্প শোভায় ভরে উঠেছে সুবিস্তীর্ণ শাল অরণ্য।

চোখ দিয়ে তাঁর নেমে এল অজস্র ধারায় মহানদীর বন্যা। সেই জল পড়তে লাগল এই শিলাসনের উপর। তিনি বললেন, নিয়ে যাও মা, ওই মূর্তি। আর আমাকে মার্জনা করে যাও।

রানী সে কথায় উত্তর না দিয়ে বললেন, এ কি? শিল্পী, তুমি কি সত্যই সর্বজ্ঞ?

ভয়ঙ্কর মূর্তিটি দেখিয়ে তিনি বললেন, এই তো আমার স্বামীর মূর্তি। চর্মরোগে বীভৎস হয়েছে তাঁর রূপ—ঠিক, ঠিক—সেই রূপ।

—ও মূর্তিও তুমি নিয়ে যাও মা। আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার পুত্র বেঁচে উঠুক! তোমার স্বামী আরোগ্য লাভ করুন। কিন্তু তুমি শ্রান্ত। কিছু আহার গ্রহণ করে যাও।

শিল্পী তাঁকে খেতে দিলেন কিছু মধু কিছু দুধ।

রানী চলে গেলেন। শিল্পী এবার পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে শিলাসনের কাছে এসে দারুখণ্ড নিয়ে বসলেন।

এ কি! এ কি! শিশুর মত আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন শিল্পী।

শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠেছে শিলাসন। নিষ্কলঙ্ক শুভ্র।

তার উপর পড়েছে জ্যোতির্ময় সূর্যের স্বর্ণ-দীপ্তি! মুহূর্তে অন্তর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ, যিনি স্বপ্নে তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনিই প্রভু পার্শ্বনাথ।

তিন

অমল চোখ বন্ধ করে স্তব্ধ হল। ·কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়েই বসে রইল। আমিও স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। কোনোও প্রশ্ন করতে পারলাম না। একটা প্রগাঢ় ভাবানুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

কিছুক্ষণ পর চোখ বন্ধ রেখেই অমল কথা বলে উঠল। একটি প্রসন্ন মাধুর্যময় হাসি তার মুখে তখন ফুটে উঠেছে। সে আবার আরম্ভ করলে, ব্রাহ্মণ কাহিনী যখন শেষ করলে, তখন আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। সেই বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে এই বিচিত্র কাহিনী শুনে আমি সমাহিত অবস্থার আস্বাদন পেয়েছিলাম সেদিন। চারিদিকে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রালোকিত শালবন, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যে দূরান্তে গাঢ় নীল পঞ্চকূট শৈলমালা; পাখির কলকাকলী ছাড়া শব্দ নেই; সম্মুখে সেই শুভ্রবর্ণ শিলাসন। এই আবেষ্টনীর মধ্যে কথক ব্রাহ্মণ আমাকে বলছিলেন এই বিচিত্র কাহিনী, ইতিহাস যার নাগাল পায় না, বুদ্ধি যাকে বিশ্লেষণ করেও মিথ্যা বলতে পারে না।

কি করে বলতে পারে? কে বলতে পারে? বুদ্ধির অহঙ্কার আমি রাখি। আমি তো কোনো অহঙ্কারেই একে মিথ্যা বলতে পারব না। সেই দিনই যে কাঁদনের ঘরে ওই গ্রামের সকলের সম্মুখে আমি ওই শুচিস্মিতা মেয়েটির হাতে মধু এবং ক্ষীর পান করে এসেছি। সে পরিতৃপ্তি যে আমার সর্ব অন্তর আচ্ছন্ন করে রয়েছে। কি করে পারব মিথ্যা বলতে? ওটাকে যদি পূর্ণ সত্য নাও বল, বিকৃত সত্য তো বলতেই হবে। অর্থাৎ ধ্বংসাবশেষের মতো সত্য। মাটি খুঁড়ে ইটের স্তূপ পেলে [illegible] মহানগরীর অস্তিত্বের সত্য যেখানে প্রমাণিত হয়, সেখানে এই মধু-ক্ষীরের সত্যই বা এটাকে সত্য প্রমাণিত করবে

না কেন? এই বিচিত্র সাধনাকে যে এরা অন্তরের প্রগাঢ় বিশ্বাসে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নিজেদের মধ্যে প্রচলিত রেখেছে, পালন করে আসছে—এ তো মিথ্যা নয়। বিচিত্র সরল মানুষ, সভ্যতার বিবর্তনের বিপ্লবের মধ্যেও এই সাধনাকে এরা ছাড়ে নি। এরা তো মিথ্যাচারী নয়। এরা সেই বিচিত্র ভারতের মাটির মানুষ, যারা ভারতের সকল ধর্মের সকল সভ্যতার কিছু-না-কিছু পরিচয় বহন করে চলেছে। ভারতের আত্মার পরিচয়ের শিলালিপি এদের অন্তরেই তো আছে।

ওই ব্রাহ্মণ হল কুলধর্মে তান্ত্রিক—ঘরে ঘোরতর মাংসাশী, অথচ এই পীঠের সেবায়েত; এবং ভূখণ্ডের ঊর্ধ্ব অধঃ সর্বস্বত্বের মালিক। এই ব্রাহ্মণই ওদের পুরোহিত। বোঝ—যোগাযোগ—সমন্বয়।

এই ভাবনার ধ্যান ভঙ্গ করলে বক্তা ব্রাহ্মণ।

অমল এতক্ষণে চোখ খুললে। হাসলে—তার সেই অভ্যাস-করা বক্রহাসি হাসতে চেষ্টা করল। বললে, এতক্ষণের ওই বিচিত্র কথক ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ তার সেই ধূর্ত বিষয়ীরূপে ফিরে ধ্যান ভঙ্গ করে। বললে, বেলা গড়ায়ে গেল বাবু মহাশয়। বলেই হাতখানি পেতে নিবেদন করলে, আপনকাদের হাত ঝাড়লে সে আমাদের কাছে পর্বত।

তার কথকতা অত্যন্ত ভাল লেগেছিল, একখানি পাঁচ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিলাম। মুখর হয়ে উঠল ব্রাহ্মণ। এই গণতন্ত্রের যুগে, যখন নিজাম থেকে কোচবিহার পর্যন্ত রাজারা সিংহাসন থেকে নেমে নীরবে সরে দাঁড়ালেন, সেই যুগে আমাকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ করলে বার বার। তারপর চেপে বসল। বেলা গিয়েছে বলে বিদায় নেবার জন্ত ব্যস্ত হয়েছিল যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি এবার চেপে বসল, আইনের পরামর্শের জন্ত। টিপিটার ওপাশে

যে সাহেব কোম্পানির পরিত্যক্ত খাদ, সেই খাদের জন্য এই ঢিপিটার সংলগ্ন খানিকটা জমি তারা ব্রাহ্মণের কাছে বন্দোবস্ত নিয়েছিল। এখন তারা পিলার কাটিং করে খাদ বন্ধ করে চলে গেছে। মিনিমাম রয়ালটিও দেয় না। এবং ব্রাহ্মণ বলে যে, কোম্পানি বিনা বন্দোবস্তে এই ঢিপিটার তলদেশও নাকি শূন্য করে দিয়ে গেছে। তার ক্ষতিপূরণও তার প্রাপ্য। এই নিয়ে সে মামলা করেছে বা করবে। কিন্তু কোম্পানি দেশ স্বাধীন হবার পর তল্পি গুটিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। আইন-সম্মত সবই সে করেছে—তবু আমার মত বিদগ্ধ ব্যক্তি, যার আষ্টেপৃষ্ঠে এমন আমেরিকান লটবহরের স্ট্র্যাপ-বন্ধন, মুখে চুরুট, তার কাছে কিছু উপদেশ সে পেতে চায়।

যথাজ্ঞান উপদেশ দিতে হল। ব্রাহ্মণ বিদায় হল। বেলা তখন প্রায় তৃতীয় পহর শেষ। অপরাহ্ণ, প্রসন্ন বার্ধক্যের মতো পরিব্যাপ্ত হচ্ছে অরণ্যভূমে। রোদে হলুদ রঙের আমেজ ধরেছে।

পাখিরা কলরব করে উঠল। দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম শেষ করে আকাশে পাখা মেলে ঝাকে ঝাকে উড়ল। কয়েকটি কেকাধ্বনিও শুনতে পেলাম।

আমি বসেই রইলাম। যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর উঠে চারিদিক ঘুরে দেখলাম। যদি সেই মহাশিল্পীর গড়া এক টুকরো দারুমূর্তির অবশেষ পাই! পাব না জানতাম। শুধু তো কালের ধ্বংস নয়, মানুষও একে ধ্বংস করেছিল। এক সময় এসেছিল এখানে পৌত্তলিকতা-ধ্বংসের অভিযান। অশ্বক্ষুরে এখানকার ধুলো আকাশে তুলে ভেঙে-চুরে আগুন লাগিয়ে সব নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করেছিল। করেওছিল। শুধু পড়ে ছিল ওই আসনখানি। যে শেষ বিগ্রহ শিল্পী নির্মাণ করেছিল, তাকে ভেঙে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে তারা

চলে গিয়েছিল, ওই পাথরখানার দিকে তারা ফিরে তাকায় নি। শুধু সেইখানিই আছে কালো পাথরের ঢিপির উপর তার শুভ্র রূপ নিয়ে। কিছু পেলাম না। অনেকক্ষণ বসে ভাবলাম। মনে হল, ওই ওদের চালাঘরের ষড়দলে—সারি সারি খোদাই মুখের কথা। সেই তো ব্রাহ্মণের কথকতার ইতিহাস। ওদিকে সূর্য নামল পশ্চিম আকাশে। অপরাহ্নের আলো শাল মহুয়া পলাশের মাথায় পড়ল। পূর্বে দূরে নিবিড় অরণ্যের মাথায় বিচিত্র শোভা ফুটে উঠল। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে অরণ্য লক্ষ্য করে উড়ে গেল। বিহঙ্গেরা পাখা বন্ধ করবার জন্য ঘরে ফিরল। আমিও উঠলাম। আমাকেও যেতে হবে। ওপারে এই পোড়ো খাদটার পরেই একটা চালুকুঠিতে ডেরা ফেলব। উঠতেই নজরে পড়ল, একটি মেয়ে অত্যন্ত মন্থর গতিতে—হয় সে খুব ক্লান্ত, নয়, সে খুব বিষণ্ণ—মাথা হেঁট করে দেহখানিকে যেন কোন-রকমে বহন করে নিয়ে উঠে আসছে। একা।

সম্ভবত সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালতে আসছে। ওই গ্রামের মেয়ে। পরক্ষণেই চিনলাম এ তো সেই কাঁদনের স্ত্রী—মোড়লের কন্যা সেই শুচিস্মিতা মেয়েটি।

নামবার জন্যে পা বাড়িয়েও নড়তে পারলাম না।

মেয়েটি উঠে এসেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বিষণ্ণ মুখে শুচিশুভ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললাম, আমি তোমাদের দেবতার স্থান দেখছি।

সে তেমনি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

আচ্ছা, আমি যাই। সন্ধ্যা দেবে বুঝি? প্রদীপ দেবে?

এবার সে বললে, না অতিথ, পেণাম করব। মানত করব। একটু চুপ করে থেকে বললে, মরদ আমার পালিয়ে গেল বাবু।

—পালিয়ে গেছে? কাঁদন?

—হ্যাঁ অতিথ। সি ইসব মানে না। তুমি অতিথ, আজকে রেতে ই-পথে যেয়ো না বাবা। সি যদি লুকায়ে থাকে, তবে—

শিউরে উঠল সে।

আমার অনিষ্ট যদি সে করে, তবে এই সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে। আকাশের নীল স্নিগ্ধ সুষমা তাম্রাভ কঠিন হয়ে উঠবে। বাতাস ভরে উঠবে শ্মশানগন্ধে! সূর্য সীসকপিণ্ডে পরিণত হবে।

আমি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। অপলক দৃষ্টিতে সেই শুচিস্মিতা মেয়েটির মুখের দিকে দ্বিধাহীন হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটিও কোন সঙ্কোচ অনুভব করলে না।

কালো আদিবাসীর কন্যা। কিন্তু যেমন শান্ত তার মাধুর্যময় দুটি চোখ, তেমনই একটি মিনতিস্নিগ্ধ শ্রী তার মুখে। ঠোঁট দুটি পাতলা কালো; দাঁতগুলিতেই তার সর্বোত্তম শ্রী—হাসলে মনে হয় মন জুড়িয়ে গেল, পবিত্র হল। অকস্মাৎ তার চোখ দুটি থেকে দুটি ধারা গড়িয়ে এল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে বললে, বাবা অতিথ, তুমি আমাদের দেবতা। তুমি আশীর্বাদ কর বাবা, যেন তার মতি ফেরে। উয়াকে আমি বিয়া করেছিলাম, বাবার কথা শুনি নাই; গোটা গাঁয়ের লোক উয়ার উপরে নারাজ; তবু আমি মানি নাই। উয়ার এ কি মতি হল বাবা? গাঁয়ের লোক বলছেক, বাবা বলছেক—সর্বনাশ হবেক, সি উয়ারই লেগে হবেক। হায় বাবা, সবাই বলছে—উয়ার নরক হবে। ই আমি কি করে সইব বাবা?

কথাগুলি বলতে শুরু করেছিল আমাকে। বলতে বলতে আবেগের প্রাবল্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে কখন যে সে শিলাসনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কথাগুলি ওই শিলাসনকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু

করেছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। বুঝলাম, যখন সে কথা শেষ করে নতজানু হল শিলাসনের সম্মুখে, হাত দুটি জোড় করলে, ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল; আবার তার শান্ত মাধুর্যময় শুভ্র দুটি চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল তখন। নতজানু যুক্তকর হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে প্রণত হল। শিলাসনের প্রান্তে মাথাটি রাখলে। আত্মসমর্পণ কখনও চোখে দেখি নি, মনে হল, আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করলাম। দেহখানি তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বুঝলাম কাঁদছে। গভীর বেদনায় মন আমার ভরে উঠল। কিন্তু আর ওখানে থাকতে পারলাম না। মনে হল, থাকা উচিত নয়, থাকার অধিকার নেই আমার।

আমি ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম। যখন এপারে একেবারে নেমেছি, তখন ডাক শুনলাম—অতিথ!

ফিরে তাকালাম। শুচিস্মিতা মেয়েটি গভীর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে ডাকছে। আমি হেঁকে বললাম, ভয় নেই। আমি ঠিক চলে যাব।

সে দাঁড়িয়ে রইল। আমি পিস্তলটা খুলে হাতেই নিলাম। কি জানি? তবে কাঁদনকে আমি হত্যা করব না। দরকার হলে—হাত বা পা খোঁড়া করে দেব। মেয়েটি আমার মনের মধ্যেই চিরস্থায়ী একটি আসন যে!

ঠিক এই জন্যেই আবার আমি ফেরার পথে এই পথই ধরলাম। দেখে যাব, কাঁদন ফিরল কি না? কিছু টাকা দিয়ে কাঁদনকে শান্ত করে যাবার অভিপ্রায়ও আমার ছিল। তা ছাড়া পুলিসের হাঙ্গামা দেখেও ও-পথে যেতে ইচ্ছে হল না। যেখান পর্যন্ত যাবার, দামোদর প্রজেক্টের কাজ যেখানে চলছে, সেখানে ঢুকতেই আমাকে দেহ

খানাতল্লাস করতে দিতে হল। বোঝ হাঙ্গামা! সেই আটচল্লিশ খোপওয়ালা পিঠে-বাঁধা ব্যাগ! তার উপর পিস্তল ছোরা কার্তুজ! লাইসেন্স আছে, পরিচয়পত্র আছে, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের সার্টি-ফিকেটও আছে। কিন্তু পুলিস তো সহজে ছাড়বে না। চোর নই—এ প্রমাণ করতেই অন্তত চার-পাঁচখানা তার পাঠাতে হবে। ভাগ্য ভাল যে দেখা হয়ে গেল বন্ধু-পুলিসের সঙ্গে। মাখনবাবু আই. বি. ইন্সপেক্টর। বিদগ্ধ জন। বাংলা সাহিত্যের এম-এ। থিয়েটার-রসিক এবং পাগল জন। তিনি ছিলেন ওই প্রথম ঘাটিতে ইন্‌চার্জ। তিনি বাঁচালেন স্ট্র্যাপ খোলার দায় থেকে। সব শুনে বললেন, এ পথে আর হাঁটবেন না। ওয়েস্ট-বেঙ্গল বেহার—দুই প্রভিন্সের আই. বি. জড়ো হয়েছে। পিছনে চাষ চলছে। ব্যাপার জানতে চাইবেন না। বলতে পারব না। আপনার জিপ এসে থাকলে খবর পাঠিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। যে পথে এসেছেন সেই পথে চলে যান, এবং যথাসম্ভব শীঘ্র। কারণ এ পথে আরও এগুতে হতেও পারে আমাদের। ব্যাপারটা একটা বড় ব্যাপার।

জিপ আসতেই রওনা হলাম।

মাখনবাবু বললেন, 'যে পথ দিয়ে এসেছিলে তুমি সে পথ দিয়ে ফিরলে নাকো আর'—ব্যাপারটা ভাল না। যে পথে আসা, সেই পথেই ফেরা ভাল। গুড লাক্!

কাপড় ছিঁড়লে যেমন সেলাই করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, যে-কোনো মুহূর্তে আর এক জায়গায় কাটে, মোটর জাতীয় যন্ত্রগুলির প্রকৃতি ঠিক তাই। একবার জখম হলে তখন মালিশ মেরামত প্যালিশ যতই কর, আবার যে-কোনো মুহূর্তে বার কয়েক উঁ-উঁ শব্দ করে থেমে যাবে। তার ওপর মফস্বলে মেরামত। মাইল পঞ্চাশেক

এসেছে—সেই ঢের। হঠাৎ থেমে গেল। গেল সন্ধ্যের মুখে একটা জঙ্গলের ভিতর, পিছনে ঢালু খাদটা—সামনে সেই ব্রাহ্মণের সীমানায় বন্ধ খাদটা, তার ওপারে সেই শিলাসনের প্রস্তরস্তূপ। ইচ্ছা ছিল, ওই স্তূপটা পার হয়ে সেই গ্রামের এলাকায় ডেরা নেব। এবার আতিথ্য স্বীকারের প্রয়োজন হবে না। সঙ্গে সঙ্গী আছে, তাঁবু আছে যা পাঁচ মিনিটে খাটানো যায়। খাদ্যদ্রব্য সব আছে। সকালে গ্রামে গিয়ে মোড়লের সঙ্গে দেখা করে কাঁদনের সংবাদ নেব। তাকে কিছু টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করব। এমন কি—

থামলেন বক্তা। একটু হেসে বললেন, আজ আমারও অশোভন মনে হচ্ছে সে চিন্তাটা, তোমাদের তো হবেই। মনে হয়েছিল, নিজের কপালে পাথর ঠুকে রক্তপাত করে কাঁদনের হিংসার উগ্রতাটা কমিয়ে দেব! তার গ্রামের জাতির অনুশাসনে যা বারণ, তাই নইলে যে ক্ষেত্রে তার কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে আমিই প্রকারান্তরে আদায় দিয়ে তার অবরুদ্ধ ক্ষোভ এবং ক্রোধকে শান্ত করব। অর্থাৎ খানিকটা কপালের রক্ত।

কিন্তু মাঝপথে রথ অচল হল। বন এখানে ঘন না হলেও মন্দ নয়। শাল পলাশ মহুয়া এখানে বেশ সন্নিবদ্ধ হয়ে অরণ্যের গাম্ভীর্যই এনে দিয়েছে। তার সঙ্গে কুর্চি এবং কাঁটা ঝোপ। কোনো রকমে জিপটাকে ঠেলে পথের পাশে সরিয়ে পথের ধারে গৃহ রচনা করা গেল। কাজের চাপ বেশি ছিল না। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। দামোদর প্রজেক্টে—জলের চাপ বাড়বে খানিকটা খনি অঞ্চলে, যে বাড়ুক, কিন্তু সে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে জলপ্রপাত-বেগ হতে, তার সাহায্যে যে জল নিষ্কাশন করা কঠিন হবে না। এই যে অঞ্চলটা—এ অঞ্চল পর্যন্ত একটি বিস্তৃত জলাধার তৈরি হবে। এ বন

তখন বোধ হয় থাকবে না। কাজেই প্রকৃতির শোভা আর ওই গল্প—শিলাসন আমার মনের মধ্যে অনায়াসে স্থান পেয়েছিল।

আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ, বোধ হয় তিথিতে ছিল একাদশী কি দ্বাদশী, আকাশ ছিল ঘন নীল; ঘনপল্লব সেই ক্ষুদ্র বনভূমির বুকে পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না পড়েছে; সে এক অপূর্ব শোভা। সত্য বলছি, বেড়াচ্ছিলাম—হঠাৎ দূরে দূরে ওই জ্যোৎস্নার টুকরোগুলি দেখে মনে হল, যেন রত্নালঙ্কার ছড়িয়ে পড়ে আছে। রামায়ণ মনে পড়ল, সীতাকে রাবণ নিয়ে গেছেন হরণ করে—তিনি আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছেন তাঁর রত্নালঙ্কার, তার কতক পড়েছে মাটিতে, কতক লেগে রয়েছে বনস্পতির শাখা-পল্লবে। আকাশের দিকে চাইতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চাঁদ চোখে পড়ে তো আকাশ চোখে পড়ে না, আকাশের টুকরো চোখে পড়ে তো চাঁদ চোখে পড়ে না। অরণ্যের ভিতরটা থমথম করছে। ডাকছে শুধু অসংখ্য কোটি কীট-পতঙ্গ। সে এক সঙ্গীত। খোলা আকাশে চাঁদ দেখতে ইচ্ছা হল। ছোট বন, বনের একটা টুকরো—ঘন বন এককালে বিস্তৃত ছিল, এখন কেটে শেষ হয়েছে, এই টুকরোটা পড়ে আছে। কোথাও কাঠঠোকরায় অবিরাম গাছের কাণ্ডে ঠোকরাচ্ছিল। আমার মনে পড়ল সেই শিল্পীর স্মৃতি। মনে হল, কাঠের উপর মূর্তি রচনা করছে বোধ হয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

বেশ খানিকটা গিয়েছি—জায়গাটা প্রায় বনটার এক প্রান্তভাগে; মানুষের সাড়া পেলাম। থমকে দাঁড়ালাম। কে কোথায়—দেখবার চেষ্টা করলাম। তাদের আবিষ্কার করার পূর্বেই কিন্তু বুঝতে পারলাম, অরণ্যচারী মিথুন; দুটি কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। মিনতিভরা মৃদু মিষ্ট

নারীকণ্ঠের বাক্যগুলি কানে ঠিক এল না। পরক্ষণেই পেলাম পুরুষ-কণ্ঠের কথা।

—না না না। কাঁদন যাবে না, সি উসব মানে না, গাঁ থেকে এই টিলা তাকাৎ মাটি মেপে গড়াগড়ি খাবে না। গাঁয়ের সবারই কাছে হাত জোড় সি করবে না। তুর বাবাকে আমি মানি না। না, মানব না।

—বাবাকে মানিস না, ধরমকে, দেবতাকে—

—না—না। কতবার বলব? ও পাথরকে আমি মানি না। আমি দেখাব, সি লোকটার লহু আমি দেখব, রক্ত লিব, দেখাব—পাথর কালো হল না, কিছু হল না। দেখাব আমি।

—না—না, বুলিস না গো, তুর পায়ে পড়ি।

—শুন্, তু যদি আমাকে লিবি তো কালকে রেতে যা পারিস নিয়ে চলে আসবি। আমি তুকে নিয়ে চলে যাব। আর না আসিস তো থাক্। কাঁদন ফিরবে না। মিছে বলে না কাঁদন।

কাঁদন আর তার বউ—সেই শুচিস্মিতা মেয়েটি।

কাঁদন সমাজবিধি মানে নি, তাকে গ্রামের লোকের কাছে দ্বারে দ্বারে পাপ স্বীকার করতে হবে, গ্রাম থেকে সাষ্টাঙ্গে ভূমি মেপে আসতে হবে ওই শিলাসন পর্যন্ত; সঙ্গে আসবে তার স্ত্রী জলভরা কুম্ভ মাথায় নিয়ে। তাই দিয়ে ওই শিলাসন ধুয়ে প্রণাম করে মার্জনা চেয়ে বলতে হবে—ক্ষমা কর। আমার পাপ ক্ষমা কর। তুমি শুভ্র থাক, নিষ্কলঙ্ক থাক। কাঁদন সাষ্টাঙ্গে ভূমি মেপে আসবে, সঙ্গে আসবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। প্রতিবার চিৎকার করে সমস্বরে বলবে, পাপীকে ক্ষমা কর হে! সে দীনতা, সে অপমান স্বীকার করবে না কাঁদন। সে চলে যাবে গ্রাম থেকে।

—কি বুলছিস? বল্? আসব কাল রেতে হেথা? থাকব দাঁড়ায়ে?

—আসব। তুর বড় আমার কে আছে বল্?

আমি এগিয়ে যাব কি না ভাবছিলাম। চিত্তগ্লানির আর সীমা ছিল না। স্থির করলাম, এগিয়ে যাই। কাঁদনের কাছে মার্জনা চাই। তার হাতে একটা পাথর তুলে দিই, বলি—মার্ আমাকে কাঁদন। তোর হিংসা চরিতার্থ হোক। তোর পরিতৃপ্তি হোক।

কিন্তু তার আগেই মোটরের শব্দ উঠল, ভারী মোটরের শব্দ—আমার জিপের নয়; বনের গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটানা, শক্তিশালী ইঞ্জিনের গোঙানি বিচিত্রভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। একটা নয়,—দুটো তিনটে চারটে। কি ব্যাপার? এই রাত্রে এতগুলি মোটর?

কাঁদনের গলা কানে এল—পালা তু। ঘরকে যা। পুলিস—পুলিস এসেছে। তু পালা।

একটা দ্রুত পদধ্বনি শুনলাম। এবার দেখতে পেলাম, একটা কুরচি ঝোপের আড়াল থেকে দীর্ঘ কৃষ্ণকায় কাঁদন অরণ্যচারী শার্দুলের মতো ছুটে পালাচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে তাকে দেখা যাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে আড়াল পড়ছে গাছের কাণ্ডে। সে মিলিয়ে গেল।

ঝোপের আড়াল থেকে উঠল সেই মেয়েটি। চিরবিষণ্ণ উদাসিনী কৃষ্ণ রাত্রির মতো কৃষ্ণকায়া মেয়েটিও চলে গেল শ্রান্ত পদক্ষেপে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। মধ্যে মধ্যে দাঁড়াল। দেখতে চেষ্টা করলে কাঁদনকে। বুঝলাম তার উদ্বেগ।

পুলিস! কিন্তু কাঁদন পালাল কেন?

পুলিস ! চকিতে মনে পড়ল, মাখনবাবু আই. বি. ইন্সপেক্টরের কথা—এদিকেও হয়তো যেতে হতে পারে।

ওদিকে ঘন ঘন জিপের হর্নের শব্দ উঠেছে। আমি দ্রুতপদে ফিরলাম। দেখলাম, আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। আমাদের আস্তানা ঘিরে পুলিস। আমার সঙ্গে পিস্তল ছোরা কার্তুজ। খুলে বসলাম সব পকেটগুলি, দেখাতে লাগলাম—কাগজের পর কাগজ, পরিচয়-পত্র। মাইনিং ফেডারেশন, চেম্বার অব কমার্স, মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স, ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র—মায় আমার ফোটো। ইতিমধ্যে এসে পৌছুলেন মাখনবাবু; তিনি হেসে বললেন—কি হল আবার ?

বললাম, জিপ অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা এখন আপনি।

বলতে বলতে আরও দুটো লরি এসে পৌছুল। পুলিস বোঝাই ! যিনি আমার কাগজ দেখছিলেন, তিনি এবার হেসে আমাকে রেহাই দিয়েও বললেন—আর এগুবেন না আপনি। সাবধানে থাকবেন। মাখনবাবু, আপনি এখানেই থাকুন।

বুঝলাম, বিশ্বাস করেও পাহারা রেখে গেলেন। আমার জিপ খারাপ, নড়বার উপায়ও ছিল না। ওদিকে ভোর হয়ে আসছে। কিন্তু কাঁদন কি ডাকাত দলের লোক? এ অঞ্চলে বড় বড় ডাকাতের দল আছে, কুঠি লুঠ করে। কিন্তু আই. বি. মাখনবাবু—

হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনলাম।

মাখনবাবু বললেন—রেড আরম্ভ হয়ে গেল।

ভোরবেলার অরণ্যভূমি মুখরিত হয়ে উঠল আগ্নেয়াস্ত্রের কঠিন উচ্চশব্দে। বহু দূরে দূরে প্রতিধ্বনি উঠছে। টিলার পর টিলা—চারিদিকে অরণ্য—প্রতিধ্বনির দেশ।

মাখনবাবু বললেন—এতবড় যুদ্ধটা গেল। মারণাস্ত্র দিয়ে পাহাড় বানিয়ে গেছে অ্যামেরিকানরা। পানাগড় ডাম্প থেকে চুরি করে প্রচুর অস্ত্র গুলিবারুদ একদল বামপন্থী এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আণ্ডার গ্রাউণ্ডে—খাদের ভিতর। কাল সন্ধ্যায় একজন ধরা পড়েছে, সে কন্‌ফেশন করেছে—

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল কোথায়। কানের পর্দা যেন ফেটে গেল। আমাদের যেন চেতনা হারিয়ে গেল। গাছগুলি যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। মাটি কাঁপতে লাগল। ঝরঝর শব্দে ধুলোমাটি ঝরতে লাগল গাছের পত্রপল্লবে। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সম্মুখ ভাগ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তিতে মাটিপাথর ধুলো ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়ছে।

আমরা বসে পড়েছিলাম।

প্রথম কথা বললেন মাখনবাবু, বললেন—ধরা গেল না। এক্স্‌-প্লোড করে দিলে। এখানকার পোড়ো খাদের তলায় একটা ডাম্প ছিল। কিন্তু আর না। এগুতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।

যেতে হবে!

বন্ধু মাখনবাবু বললেন—সেজন্যে নয়। আসুন। আমারও দায়িত্ব আছে। আপনিও নিরাপদে থাকবেন।

লরি গর্জে উঠল। চলল।

কিছুদূর গিয়ে অরণ্যপ্রান্ত। সামনে সেই টিলা। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেই শুভ্র শিলাসনখানি। টিলার ও মাথায় দেখা যাচ্ছে মানুষ, পুলিস।

- হঠাৎ আবার শব্দ উঠল

বিস্ফোরণের নয়। একটা গোঙানি। ভূমিকম্পের সময় গোঙানি

শুনেছ? অনেকটা সেই রকম। ভূমিকম্প—গাছ দুলছে, মাটি কাঁপছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম, রোখো, রোখো।

ড্রাইভার ভয় পেয়েছিল, সে রুখলে।

বললাম, পিছিয়ে—পিছিয়ে চল।

—কেন? মাখনবাবু প্রশ্ন করলেন। ভূমিকম্প? এ কি? এ কি?

—না। সাবসাইড্।

—কি?

—খাদ ধসছে। ভিতরে পিলার কাটিং করে নিয়ে গেছে বণিকের দল। উপযুক্ত, কি আদৌ স্যাণ্ডপ্যাকিং করে নি। প্রচণ্ড এক্সপ্লোশনের ফলে সে ধসছে। নিচে নেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর বুক ফাটছে। ওই দেখুন।

ভাগ্যক্রমে আমরা এলাকার বাইরে ছিলাম। সামনে মাটি ফাটল, বসতে লাগল। বড় বড় বনস্পতি দুলতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, তার বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ছে—বড় বড় মূল ছিঁড়ছে ঝড়ের জাহাজের কাছির মতো। কাঁপতে কাঁপতে হেলতে লাগল, সশব্দে পড়ল। মাটি বসছে। ভিতর থেকে বদ্ধ বায়ু সশব্দে উঠছে ঘূর্ণাবর্তের মতো। পাথর ছুটছে। সে এক দৃশ্য। একটা যেন খণ্ডপ্রলয়। একটা মহাকালান্তর। বিরূপাক্ষ নাচছে। মাটি বসে গেল।

এ কি?

'এ কিই' বা কেন? হাসলাম। সেই মহাসাধকের সেই টিলা ফাটছে। এই প্রচণ্ড টানে সেও ধসে পড়ছে। মহাশব্দ করে সে পড়ল। এতে 'এ কি' বলে প্রশ্ন করছি কেন?

শিলাসন! শিলাসন গেল, নবযুগের সুড়ঙ্গপথে পৃথিবীর বুকে যে ফাটল ধরল, তারই মধ্যে পাতালগর্ভে চলে গেল!

ও আর কালো হবে না? ও কালো হলে আকাশ আর তামার বর্ণ ধারণ করবে না? বাতাসেও উঠবে না শবদাহের গন্ধ! হারিয়ে গেল, অতীত কালের মতো মুছেই গেল!

যাক। তাতেই বা ক্ষতি কি?

আছে ক্ষতি। ওই ধসে-পড়া টিলার প্রান্তে দাঁড়িয়ে দলে দলে নরনারী কাঁদছে। বুক চাপড়াচ্ছে বৃদ্ধ মোড়ল।

ও কি?

ছুটে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। কাঁদনের স্ত্রী, মোড়লের কন্যা।

—দেবতা, ফিরে এস। আমার স্বামীর পাপ ক্ষমা কর।

চিৎকার উঠল চারিদিক থেকে। কিন্তু শুচিস্মিতা শান্ত মেয়েটি আজ উন্মাদিনী। সে ব্যাধ-ভীত হরিণীর মতো লাফ দিয়ে নামল ধ্বংস স্তূপের মধ্যে। কখন যে বসে যাবে সে-স্তূপ কেউ বলতে পারে না। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কই সে আসন? কোথায় সে আসন?

উন্মাদিনীর মত সে খুঁজতে লাগল। তার স্বামীর প্রতি সহস্র মানুষের অনুযোগ সে সহ্য করতে পারবে না। কাঁদনের অনন্ত নীরস পরিণামের কথা ভেবে সেই মহাভারতের যুগের নারী অধীর হয়ে উঠেছে। তার বাপের বুক-চাপড়ানি সে দেখতে পারছে না। ওই পাথর হারিয়ে যাবে,মাটির ভিতরে কখন কলঙ্কে কালো হবে,আকাশ তামার বর্ণ ধরবে,বাতাস শবদাহের গন্ধে ভরে উঠবে,নদীর জল দূষিত হবে, গাছের পত্রপল্লব ঝরে যাবে, কীটে আচ্ছন্ন হবে, জ্যোর্তির্ময় সূর্য স্তিমিত হয়ে সীসকপিণ্ডে পরিণত হবে এই মহাভাবনায় সে উন্মাদিনী। সে জানে, কাঁদনই এর কারণ। সে তার প্রিয়তমা। পাপ তার। সে খুঁজছে। শিলাসন—কোথায় শিলাসন? তুলতে যে তাকে হবেই।

কিন্তু প্রকৃতি কাল নিষ্ঠুর।

মাটি বসছে। উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ধূলার রাশি আকাশ স্পর্শ করলে।

*   *   *   *

চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল অমলের। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তারপর আবার বললে, মানুষ কিন্তু প্রকৃতির শক্তির কাছে হার মানে না। মানুষ আশ্চর্য! গোটা গ্রামের মানুষ যারা বুক চাপড়াচ্ছিল, তাদের মুখে চোখে ফুটে উঠল সে কি বিস্ময়কর দৃঢ়তা, কঠিন পবিত্র সংকল্প! পিঁপড়েরা যেমন ধ্বংস-হওয়া বাসস্থান উদ্ধার করে, তেমনই ভাবেই নামল তারা সেই গভীর গহ্বরে। তারপর দীর্ঘ তিন দিন ধরে মাটি পাথর সরিয়ে তুলে আনলে সেই শিলাসন। আশ্চর্য, মেয়েটিই আঁকড়ে ধরে ছিল সেই আসনখানি।

প্রায় অক্ষতই ছিল সে আসনখানি। ছুটো একটা টুকরো কোণ থেকে ছেড়ে গিয়েছিল।

হাত বাড়িয়ে সামনের তাক থেকে এক টুকরো সাদা পাথর নামিয়ে নিলে অমল তার মাথায় ঠেকালে। বললে, আমি ভাবছি শুধু সেই দেবতার কথা, যে দেবতা এই আসনের উপর ছিলেন তার কথা। আর ভাবি মূর্তিমতী নিষ্ঠার মতো ওই শুচিস্মিতা মেয়েটির কথা।

॥ শেষ ॥